বর্মাবিজয়

শ্রীমতী বাণী রায়

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—তিন টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—শ্রীসুখেন গুপ্ত

মুদ্রণ—ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীভানু রায় কর্তৃক প্রকাশিত

ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৩৭।বি, বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা-৯ হইতে

শ্রীপ্রদোষকুমার পাল কর্তৃক মুদ্রিত

মাতামহ দীননাথ শাস্ত্রী পুণ্যস্মৃতিসহ

বড মামা, ছোট মামা ও ছোট মাসীমাকে দিলাম

এই লেখিকার

জুপিটার
পুনরাবৃত্তি
প্রেম
রঞ্জনরশ্মি
শ্রীলতা ও সম্পা
প্রতিদিন
কনে দেখা আলো
শূন্যের অঙ্ক
সপ্তসাগর
হাসি-কান্নার দিন
ঊষা-অনিরুদ্ধ—হৃদয়ের মৃত্যু

এমন বর্ষায় বীজ রোপণ ও নানাবিধ চাষবাসের কাজ আয়ত্তাধীন সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু পাহাড়ি বর্ষার রূপের অন্য মুখও আছে। পুঞ্জীকৃত নীল মেঘ জমে ওঠে কুর্চি ফুলের, গুল্মপত্রের দেশে আকাশ-প্রত্যন্তে। সবুজে ঘনায় কাল অঞ্জন। লাল মাটি তৃষায় বিদীর্ণ—আকাশে স্বস্তি শুধু। দারুণ গ্রীষ্মের দহন-বহ্নির অন্তে আছে আকাশের দাক্ষিণ্য।

আজ তেমনি মেঘদূতের দেশে বর্ষারম্ভ দেখলাম। দেখলাম, বিস্তীর্ণ আকাশমণ্ডপে অনেকদিন পরে উন্মত্ত প্রাবৃট-সমারোহ। বিগত-জীবনা-বল্লরীর পত্র-গুণ্ঠন যে ঝঞ্ঝা অপসারিত করে তাকে উজ্জীবিত করবে, সে ওই নৈঋর্ত কোণে দেখা দিল। দেখা দিল আমের পল্লবিত আশ্রয়ে নীড়ভিক্ষু পাখীর দল।

এমন বর্ষা যে আমাকে নিয়ে যায় টেনে। অতীতের ঝড় ওঠে নিস্পন্দ বর্তমানের শিরায়-শিরায়। আমাকে ছিনিয়ে নেয় দুর্গসীমার বাইরে। বর্তমানের আশ্বাসের দুর্গ। প্রাবৃটসঙ্কুল পৃথিবী ভয়ের হাসি হাসে।

সেই পুরাতন বাড়িটি—টিলা পাহাড়ের রুক্ষ বুক ঘেঁষে, প্রণয়ভীতা প্রেয়সীর আত্মসমর্পণে। সেই খালের জল, যার যোগ পর্বতের আপাতসুপ্ত উৎসধারায়। ভুল হয়েছিল সেদিন নির্ঝরের ক্ষণসুপ্তিকে চিরন্তনী মনে করায়। যখন জাগে পাহাড়িয়া ঝরণা, সে হয় আত্ম-

বিস্মৃত। চলার পথে তার উপলসঞ্চয় নূপুর-নিক্কনে খসে পড়ে সমতলের আলিঙ্গনে। গাছের বাধা ভেসে যায় গতির বেগে, ভেসে যায় মানুষের রচিত আশ্রয়কেন্দ্র। উন্মাদ সেই ধারার ধ্বংস-নৃত্য দেখেছিলাম একদিন।

বর্ষায় গাঁথা জীবন আমার, করুণের বীণায় বাজে। মধুরের অঙ্গুলি কখনও তন্ত্রীঘাত করে। বিষ ও মধুমেশা জীবন আমার। সম্পূর্ণ বর্জন বা গ্রহণ অসম্ভব। তাই সরু-মোটা দুই তারের জীবন-বীণা গ্রহণ করেছি প্রাণসরস্বতীর হাত থেকে। ভোলা, না-ভোলার পণ আমার! যাকে ভোলা যায় না, তাকে কি ক'রে দূরে সরাই? কাছে রাখা যে গোলাপ, তার কাঁটা কাঁদায়। তবু, গোলাপের সৌরভ যে ব্যথাজয়ী।

মনের আকাশে প্রাত্যহিক মেঘ-সমাগমের বর্ষণক্লান্ত নীরদমালায় ফুটে ওঠে একখানি মুখ। জীবনের পরম আত্মীয়জন। আমার কনিষ্ঠতম অঙ্গুলিপ্রান্তেও তাঁরই রচনামাহাত্ম্য লেখা আছে। এই হাতের ক্ষীণ তন্তু পর্যন্ত যে শোণিত বহন করছে, তা-ও তাঁরই সৃষ্টি। ভোলা যে অস্তিত্বকে ভোলা।—আমার মা।

সে মূর্তির মুখবিম্ব স্নেহকোমল, বিহ্বল মাতৃত্বমণ্ডিত নয়। তীক্ষ্ণধী ললাটে ভ্রূকুঞ্চন, উচ্চ নাসিকায় আত্মপ্রতিষ্ঠা, আর অধরসীমায় গোপন বাক্যনিগড় দৃষ্টিমাত্রে প্রতিভাত হয়।

ভোলা, না-ভোলার সংকল্প আমার বিগত দিনের স্মরণসম্ভার অবচেতনে সরিয়ে রাখে। অশ্রুব্যাকুল দিনের স্মৃতি লেখা হয় বর্ষা-চুম্বিত আকাশে, ধরিত্রীতে। পৃথিবীর মুখে মুমূর্ষু আলো লাগে।

এমন দিনে ফিরেছিলাম। পড়া শেষ হয়ে গেছে। ছাত্রী-আবাস আমার কাছে রুদ্ধ। বিহারী-চরিত্র, বাংলার আধিপত্য আমার গন্তব্য-নিবাসে। মা থাকেন অনুচরবেষ্টিত বাংলোর নির্জনতায়।

এসেছিলাম কয়েক বার ছাত্রী-জীবনে। কয়েক বার বোর্ডিংবাসিনী কন্যার তত্ত্বাবধানে মা গিয়েছিলেন। শৈশব থেকেই পরভৃত-ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিলাম। পিতৃবিয়োগের পূর্ব থেকেই আমি পরবাসী। আমাদের বাসা ছিল পল্লী ও সহরের মিশ্রিত ভৌগোলিক পরিবেশে।

ফিরে আসার দিনে যখন বাসভূমির রাঙামাটি সাইকেল-রিক্সার চক্রক্ষেপে চিহ্নিত হয়ে বাড়ির, কাছে নিয়ে যাচ্ছিল আমার মনের কোন প্রদেশে একটুও আনন্দ পাইনি। পাইনি ভবিষ্যতের আশ্বাস।

বর্ষণপ্রতীক্ষু আকাশের ইন্দ্রনীলসম্পদ আমার মনে মুগ্ধতা আনেনি। কুর্চিগুচ্ছ রামগিরির প্রাচীন মাধুরী-স্বপ্ন জাগরুক করতে পারেনি। নিঃসীম শূন্যতায় যে দেবদারু, যে শাল চিত্রায়িত, তাদেরই পাতায় পাতায় শুধু বাতাসের উদাসী সঙ্গীত—গৃহহারা-পরবাসীর গান। আসন্ন বর্ষণে আশ্রয় কোথায় ?

মনে হয়নি আমার, যাচ্ছি পরিচিতা, একান্ত আত্মীয়ার কাছে, যিনি স্বর্গের অপেক্ষা গুরু, যিনি প্রভাতে প্রথম বন্দনীয়া। তিনি কি আমার অন্তনিবাসিনী জননীমূর্তির যথার্থ প্রতীক ? হায়, তিনি যে পর।

চাকার তালে এক কথা, তিনি যে পর, তিনি পর, তিনি পর। পদ্মিনী, তুমি কি ক'রে মনের কাছে স্বীকার করবে, যিনি সবচেয়ে আপন, তিনিই সবচেয়ে পর ?

মাথার উপরে সেদিন ডানার ভিড় ছিল--প্রত্যাগত পাখীর দল। মন্দ্রমুখর ইন্দ্রনীল আকাশের নীচে ঘণ্টা বেজে উঠল তিনটি শব্দে—বৌ কথা কও! ব্যঞ্জনায় পাওয়া গেল ঃ তিনি যে পর!

চাষের উপযোগী প্রাকৃতিক পরিস্থিতি। ধানের জমির কাছে দাঁড়িয়েছিল বাল্যবন্ধু কল্লোল। সমুদ্রের ধ্বনি তার জন্মশঙ্খরোলে মিশেছিল উড়িষ্যার সমুদ্রতটে। তাই সে কল্লোল।

মায়ের প্রবল রূপবহ্নি অঙ্গরাগ করেছিল সন্তানের। আমি তাই পদ্মিনী।

"তুমি ফিরে এলে পদ্মিনী? পড়াশোনা এত দিনে শেষ হল?" কৃষাণদের নির্দেশ দিয়ে সরে এল কল্লোল। মাথার গ্রাম্য মাথাল খুলে ডালে রাখা হল। বর্ষাতি ঝুলছে সেখানে।

"তুমি না ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছিলে, কল্লোল?"

"মাটির ইঞ্জিনিয়ার হতে হল শেষে। জানো বোধ হয়, বাবার পক্ষাঘাত হয়েছে? এত জমিজমা না দেখলে নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের তো আর কেউ নেই, পদ্মিনী!"

"আমি কিছুই জানি না, কল্লোল। বাড়ির পথে তোমার বাবাকে দেখে যাব।"

ছেড়ে এলাম কৃষিকাজ। পড়ে রইল কল্লোল মাটি-মাখা, স্বেদ-ছড়ানো কাজের কবলে। ততক্ষণে 'বৌ কথা কও' আশ্রয় পেয়েছে। আবার ডেকে উঠল দীর্ঘস্বরে ক্লান্ত চাতক।

মা প্রতীক্ষা করছিলেন ডেক্‌চেয়ারে। কাছে খাস-ঝি অহল্যা দাঁড়িয়েছিল। প্রবাসিনীর অভ্যর্থনা প্রস্তুত আছে।

আহারান্তে শয়নকক্ষ দেখিয়ে মা বললেন, "তোমার ঘরে এখন আর কিছু আসবাবপত্র লাগবে? এখন তো এখানেই থাকতে হবে। কাল কাঠ-মিস্ত্রীকে অর্ডার দিয়ে দেব। আপাততঃ, আয়নাখানা এসেছে।

স্বর্ণ-আঙুর-উৎকীর্ণ বন্ধনীর মধ্যে একখানি বৃহৎ মুকুর। আমার যৌবনকে ম্লান ক'রে দিয়েছে জননীর প্রতিফলন। কাল চুলের কিরীটি-ধৃতা তিনি গরিমাধার মহারাণী। ওই মুখে কোথাও ভীরু স্নেহের দুর্বল আতিশয্য নেই।

"এত খরচে দরকার কি, মা? আমার কিছু চাই না।"

রেফারীর বাঁশীর মত তীক্ষ্ণ ধাতবকণ্ঠে শোনা গেল, "টাকার চিন্তা করতে হবে না তোমাকে। শুধু নিজের ভাল-মন্দে দৃষ্টি রেখো তুমি। সেই শিক্ষাই তোমার বাকী, পদ্মিনী।"

একাকী ঘরের বৃহৎ মুকুরে যে রূপস্বপ্ন জেগে উঠেছে, কই আমি তো তার আত্মপ্রসাদস্ফীত পূজারী নই? আমার প্রতিবিম্ব নিজের রূপবিহ্বল, আমার সত্তা অমনোযোগী, চিন্তাবিক্ষত।

আমাদের টাকার অভাব নেই। কোন দিন অভাব অনুভব করিনি। দরিদ্র পিতা বিত্তের সান্ত্বনা রেখে যাননি মৃত্যুতে। কিন্তু আমাদের দিন চলে যায়, কোন প্রয়োজন অপূর্ণ না রেখে। আমাদের দিন চলে যায় আয়াসের পিচ্ছিল সহজ পথে। রত্নখনির আভাস মাত্র জানি না।

মা এখানে একটি কারিগরী শিক্ষার কেন্দ্র খুলেছেন দুঃস্থ মহিলাদের জন্য। সরকারী সাহায্য আসে। কলিকাতায় উৎপন্ন দ্রব্যের বেসাতি স্বয়ং তিনি তদারক করেন।

নিষ্পাপ চরিত্রের খ্যাতি আছে মায়ের। অনমনীয় দৃঢ়তার তিনি ভারকেন্দ্র। অবহেলা জীবনে পাইনি। পাইনি দুর্বল স্নেহের স্নিগ্ধতা। একমাত্র সন্তানকে তিনি মানুষ করতে চেয়েছেন নিজের কাছ থেকে সরিয়ে রেখে। দূরত্ব রেখেছেন ব্যবহারের কোণায় বেঁধে। তিনি জননী, মা নন।

বিছানায় আশ্রিতের চোখে সহজে এল না বিস্মরণীর বিশল্যকরণী নিদ্রাবেশ। মনে পড়ে গেল কল্লোলের বাবার কথা। বাড়ির বারান্দায় পক্ষাঘাতহত বৃদ্ধ বসেছিলেন। আমি গেলাম কাছে। দূরের মানুষ আমি তাঁর। কখনও নিকট হইনি।

"এমন হয়েছে, আপনার? আমি জানতাম না।"

"যত না জান, ততই স্বস্তি।" হঠাৎ শান্ত দৃষ্টি বৃদ্ধের উদ্দীপিত হল ক্ষণ-প্রাখর্যে—গলায় নামল ঘৃণার সুর—"তুমি এখন বাড়ি যাও, পদ্মিনী।"

শয্যার শান্তিশিথিলতায় এখন সমস্ত ব্যবহার তাঁর সঙ্গতিবিহীন মনে হল।

কেটে যেতে লাগল দিনের ব্যর্থ সমষ্টি। আপনাকে পর রেখে দূর বাড়ায় যে অনিবার্য গ্লানি, তাই গ্রাস করতে চাইল আমাকে। কাছে এসেও মা আমার আপন হলেন না।

নিষেধে শাসিত অস্তিত্ব আমার পাহাড়ি টীলার পাশের বাড়ির নির্জন আলিঙ্গনে অক্ষম আত্মসমর্পণ করল। শুধ্ কল্লোলের সাহচর্য মুক্তি দিত নিরলম্ব শূন্যতা থেকে কখন কখন। বাল্যবন্ধুর দাবী সমাজ এখনও অস্বীকার করে না।

মা প্রায় চলে যেতেন কলিকাতায় পণ্যহাটে। অহল্যা আমাকে দেখে রাখত। অর্থ যার উপার্জন ক'রে আনতে হবে, সে নারীর বহির্গমন স্বয়ংসিদ্ধ সত্য।

ক্লান্ত দেহে ফিরে আসতেন মা। নিজের ঘরের বিজন গুহায় দিন তাঁর কেটে যেত হিসাবের খাতা ও সেলাই-এর নমুনার আবর্জনায়। খাওয়ার সময়ে মুখোমুখি টেবিলে পাত্র পড়ত আমাদের। অতিথি একসঙ্গে দু'জনকে বসবার ঘরে পেত। এইমাত্র।

প্রাচুর্যে আমাকে মা স্তব্ধ করেছিলেন। কতদিন বিস্ময় বোধ করেছি এই রত্নখনি কোথায় আছে? আমার স্বাধীন জীবিকা আছে এই ঘুমন্ত বাড়ির বাহির-সীমায়। সে আমার কাছে নিষিদ্ধ ফল।

বলে ব্যর্থ হয়েছি। মা কুঞ্চিতভ্রূদৃষ্টি মুখে রেখে বলে দিয়েছেন,

“টাকার চিন্তা তোমার করতে হবে না। তুমি নিজের চিন্তা করো।”

অতিথি অবশ্য আসত কেউ কেউ। পাড়ার বাড়ির মেয়েরা ভাব জমাতে এসে বিফল হয়েছে। ফিরতি দর্শনের অনুমতি মেলেনি আমার। এসেছে মায়ের কাছে কার্যব্যপদেশে নানা ব্যক্তি। এসেছে কল্লোল। এসেছে মরাল।

শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি মরাল। বিহার-বাংলা ব্যেপে বিরাট কয়লার ব্যবসা তার। বিধানসভার সদস্য। মাননীয় কর্মকর্তা বহু আয়োজনের। মা তাকে নিজ কেন্দ্রের সভাপতি রেখেছিলেন। আগে চিনতাম, এবারে সে অন্তরঙ্গতা করতে চাইল।

বয়সের দাবীতে সে আমার সম্মানীয়। বন্ধুত্ব সেখানে অচল। একদিন বলেছিলাম তার কোন ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে, “মরাল সরস্বতীর বাহন বলেই জানতাম।”

“জানো না, মরাল আবার পদ্মিনীর প্রিয়। ভক্ষকও বলতে পার।”

“তাই নাকি? পদ্মিনীর হয়তো নামে মিল আছে। মরালের নাম কচ্ছপ হলেই মানাত ”

অপমানে, ক্রোধে বিভীষণ হয়ে উঠল মরালের কুশ্রী মুখ, “তাই নাকি? আমাকে অপমান করার আগে তোমার মায়ের মতটা নিও, সুবোধ মেয়ে।” দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল মরাল সু-উচ্চ পদতাড়নে। মনে মনে হাসলাম।

তখনি এল অহল্যা গম্ভীর আষাঢ়কবলিত মুখে।

“খোকীমা, তোমার মা বলে দিলেন লোকজনের সঙ্গে ভদ্দর চালে চলবে।”

মরাল পথে চলে গেছে, মা দোতলায়। নিচে বসবার ঘরের কাহিনী অকথিত। তবে ?

জিজ্ঞাসাচ্ছলে প্রতিবাদ জানালাম, "তোমাকে দিয়ে বলে পাঠালেন কেন ?"

"তাঁর মাথা ধরেছে। জানালা থেকে শেঠী বাবুকে যেতে দেখলেন।"

বুঝলাম, মরাল শেঠের গমনভঙ্গি মাতাকে জ্ঞানী করেছে। নিরক্ষরা দাসীও আমার চেয়ে বুদ্ধিমতী। আমার না-বলা প্রশ্নের উত্তর দিল সে। নির্বাক্ হলাম।

সেইদিন বিকালবেলায় কল্লোল কথা বলল। আমাদের বাড়ির পাশের শীর্ণ খাল শহরের প্রান্তে চলে গেছে। কল্লোলেরও বাড়ি খালের ধারে একটু দূরে টিলার ওপর। তার জমিজমা অবশ্য সারা গ্রামে ছড়িয়ে দেহাতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়েছে। খালের ধারের নিশানা ধরে গেলে কোন না কোন সীমায় কল্লোলকে পাওয়া যায়।

আমাকে কল্লোল আজ একটু দূরে ডেকে নিল। পাহাড়ি জমি সেখানে আপনি উঁচু হয়ে নোনাগাছের ছায়া ভিক্ষা ক'রে নিয়েছে। দূরে ছোটনাগপুরের পাহাড়ি পরিপ্রেক্ষিতে অস্তমান রক্তিমসমুদ্র দিনের সূর্য। আমি সেখানে বসলাম। একটু নিচে ঢালু জমির ওপরে বসল কল্লোল।

যে কথা সে আমাকে বলেছিল, তার পুনরুক্তি সান্ধ্য তারাটির পর্যায়ে পড়ে। প্রাত্যহিক উদয় ও-তারার, তবু সে স্বাগতা। দিন-শেষে আকাশের নীলিম ধূসরে প্রতিদিন সে সব কথা চাঁদের দোলনায় দোলে। শিশিরের চোখে সুখ-বেদনায় ঝরে। প্রাচী-প্রান্তে স্বর্ণবাসা উষার পদচিহ্নে শুকতারার মত উন্মুখ প্রত্যাশায় ঘুম ভেঙে ওঠে। সে

কথা স্থিতির শৈলে চির-প্রোথিত। তবু তার ধরা দেওয়ার লগ্ন সাধনা-সম্ভব।

"এ রূপ চিতোরমহিষীর যোগ্য। ভীমসিংহের শৌর্য আমার নেই। কিন্তু, আলাউদ্দীনকে তো বাধা দিতে হবে?"

কল্লোলের কণ্ঠস্বরের উগ্রতায় বিস্মিত হলাম, "আলাউদ্দীন কে?"

"কেন, মরাল শেঠ? তোমার মা তোমাকে বন্দী করেছেন, পদ্মিনী! তুমি যে অসহায়।"

"কিন্তু কল্লোল, তোমার বাবা যে আমাকে পছন্দ করেন না?"

অন্যমনা হয়ে গেল শূরী ভীমসিংহ, "না, তোমার অনুমান ভুল। অলক্ষিতে উনি তোমার প্রশংসা করেন। তবে, হ্যাঁ, সম্মুখে দেখলে একটু কেমন যেন হয়ে যান। বোধ হয়, তোমার বাবার আকস্মিক মৃত্যু মনে পড়ে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন দু'জনে। তুমি তো জানই।"

সে বিয়োগস্মৃতি আমার মনে মূল পায়নি। আমি ছাত্রী-আবাসে। সহসা শুনেছিলাম বাবা আর নেই। ড্রাই কলেরা হয়েছিল।

আমার বিষণ্ণ মুখে দৃষ্টি রেখে বলে উঠল কল্লোল,—'শিরীষকুসুম জিনি যাহাদের তনু, দেখিয়া যাদের রূপ রথ রাখে ভানু।' গেঁয়ো চাষার কৃত্তিবাস ভিন্ন গতি কি?

পায়ের কাছে ফুটে ছিল ঘাসফুল। ব্যগ্র ক'রে আমার পায়ের ওপর কয়েকটি রাখল কল্লোল, "জীবনে প্রথম দাসত্ব স্বীকার করলাম।"

আকাশে মেঘ দেখা দিল। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনেও নেমে এল বর্ষা। বর্ষায় গাঁথা জীবনের দিনগুলি আমার।

জলের আশ্রয় খড়ের কুঁড়ে ঘরে এমনি দু'জনে। ঝড় গর্জন করছে নম্রশীর্ষ ধানের তরঙ্গে তরঙ্গে। মাটির দেওয়ালে ভার রক্ষা ক'রে দাঁড়ালাম। দরজার আগড় তুলে দিল কল্লোল।

বিস্মৃতা পৃথিবী পড়ে রইল দূর দিগন্তে—সমস্ত জগৎ সংহত হয়ে এল ঘরের মৃত্তিকা-প্রাকারের মধ্যে। ঘিরে ধরল অজানা অভিজ্ঞতার প্রলুব্ধ প্রয়াস। কল্লোল আর আমি। সারা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-বারিধিতে দুটি মাত্র বিযুক্ত সত্তা। যুক্তসত্তার অভ্যুদায়িকে জন্ম নেবে নূতন পৃথিবী।

বৃষ্টির মৃদু গুঞ্জন প্রবল আর্তনাদে পরিগণিত হল। কল্লোলের নিমেষহারা নেত্র-তারকায় দেখলাম আপনার নূতন ছায়া। তার হৃৎ-স্পন্দন শ্রুত হল আমার হৃদয়ের স্পন্দিত শ্রুতিতে। পাহাড়িয়া প্রকৃতি ধারাস্নানে উলঙ্গ উল্লাস ব্যক্ত করল। বৃষ্টির অবিরত কলধ্বনি!

আমার নিদ্রিত সত্তায় আবির্ভূত হলেন প্রাণ-সরস্বতী—পদ্মিনী, সরু-মোটা দুই তারে যে জীবন-বীণা আমি বাজাই, আজ তার ঐক্য-তান শোন। যে জীবনে পূজার পবিত্রতা; সেখানেই উপভোগের প্রাচুর্য।

ক্ষতি কি? আজ ওরই মধ্যে নিঃশেষিত আমি নূতন জীবনে জেগে উঠি না কেন?

আমার সমর্পণের প্রশান্তি ভিন্ন উপায় কি? যে আমাকে কঠিন বক্ষে কঠিনতর পেশীর পীড়নে পিষ্ট ক'রে ধরেছে, এই মুহূর্তে পৃথিবীতে আমি তার কাছে একমাত্র নারী। প্রতিরুদ্ধ প্রশ্বাসে তার শ্লথবস্ত্র আমার কম্পিত। চুম্বনের করকাপাতে দেহতট বিপর্যস্ত। আমার কায়ার পুষ্পসম্ভারে দুরন্ত ঝড় সে।

নিবিড় অন্ধকারে দু'জনের মধ্যে সূত্র ব্যবধান ছিল না। বাঁ হাতে জানুর পকেট থেকে কল্লোল তীব্র টর্চ বার করল। বোধ হয় আমার কৌমার্যের শেষ শুচিশুভ্রতা দেখতে।

আলোর দহনে অনভ্যস্ত চক্ষুর পলকে চলে গেল কল্লোল ঘরের

অপর প্রাচীরে। হতাশা-যন্ত্রণামথিত স্বর শুনলাম, "আমি পাগল হয়েছিলাম, পদ্মিনী ? যা তপস্যার সিদ্ধি, জোর ক'রে তাতে অধিকার নিচ্ছিলাম।"

প্রাবৃটের আকাশে হয়তো বিদ্যুতের দীপ্তি নিবে যেয়ে ক্ষণনিমিত্ত উদয় হয়েছিল স্বাতী-নক্ষত্র ; মনে মনে বলেছিলাম, 'তোমার মহত্বে আজ থেকে তুমি আমার জীবনাধিক হ'লে।'

ক্ষান্ত-বর্ষণ মেঘের প্রসন্ন অনুমোদনে সরু আলের রাস্তা ধরে কল্লোল আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিল।

দরোয়ান আলো ধরে খুঁজতে গেছে। মা বসে আছেন। অহল্যা পদসেবা করছে।

আমার প্রথম বলার কথা যাঁকে, তাঁকে এড়িয়ে চলে যেতে পথ নিলাম নিজের ঘরে। ধাতব কণ্ঠ আদেশ দিল, "দাঁড়াও। কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?"

সাহস হল না সত্যভাষণে, "কল্লোলের বাড়ি বসেছিলাম বৃষ্টি দেখে।"

"বাড়িতে বসেছিলে, কাপড় ভিজেছে কেন ?"

"পথে যেতেই বৃষ্টি পেয়েছিলাম।"

তীক্ষ্ণক্রূর একটা দৃষ্টি আমার সর্বদেহে সঞ্চারিত হল—"হুঁ ! যাও, কাপড় ছেড়ে এখানে ফিরে এসো। অহল্যা, গরম দুধ দে ওকে।"

ফিরে আসতে হল। মা আমার অলঙ্ঘনীয়া।

"শোনো পদ্মিনী, নিজের ভাল সকলেই বোঝে। মূর্খ তুমি, অতি নির্বোধ। যা হবার হয়েছে। ভবিষ্যতে কল্লোলকে তোমায় ছাড়তে হবে। এতদিন বলিনি কিছু।"

আতঙ্ক শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে এল কণ্ঠদ্বারে, "কি আপনি বলছেন, মা? কি আবার হবে?"

ধাতব স্বরে তীক্ষ্ণতা শোনা গেল, "পদ্মিনী, চুপ করো! আজ থেকে এক মাসের মধ্যে মরাল শেঠকে তোমায় বিয়ে করতে হবে।"

উঠে দাঁড়ালাম আসন থেকে, "অসম্ভব।"

"ক্ষেতী চাষার কুঁড়ে ঘরে দু-ঘণ্টা কাটাবার পরে ভবিষ্যৎ ভেবে ব্যবস্থা রাখতে হয়।"

দারুণ বিস্ময়ে প্রথমে এল রোষ—"আমরা কিছুই করিনি। যে চর খবর দিয়েছে, সে ভুল করেছে।"

"পদ্মিনী আমি জানি মানুষের কতটা ধৈর্য, কতটা ক্ষমতা। নিজের কীর্তি অনেক সময় বলে জানাতে হয় না।"

বুঝলাম, তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেখেছে আমার প্রেম-সাধিত রূপ। প্রেমিকের সোহাগ-করচালনে শিথিল কবরী-বন্ধন, বসনের শ্লথবিন্যাস। শুভ্র ত্বকে ফুটে উঠেছে পিপাসিত অধরের পীড়নের নীলকান্তমণি। দেখেছে অধরের বঙ্কিম কোণায় আশাসিত প্রেমের স্মারক রক্তরেখা।

মাথা নামিয়ে বললাম, "আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বলছি, মা।"

উঠে দাঁড়ালেন তিনি এবার, "প্রতিজ্ঞায় আমার বিশ্বাস নেই। আমার চোখ ভুল করে না। অনিবার্য ফলের দায়িত্ব আমি যাকে দেব, সে ওই চাষী গৃহস্থ নয়। একটি কথাও না। খেতে যাও ঘরে।"

তিনি দোতলায় উঠে গেলেন। যেখানে বিশ্বাস নেই, সেখানে বাক্য বৃথা। যে অপরাধ করিনি, তারই ভারে মাথা নামিয়ে চলে এলাম।

বৃহৎ মুকুরে আজও ফুটেছে এক সুন্দরী। এ আয়না তো তারই রূপাভিমান জাগাতে? এ বিলাস-প্রয়াস তারই প্রবৃত্তির মুখ ফেরাতে

ঐশ্বর্যের দিকে। চিতোরের পদ্মিনীর প্রতিফলন হয়েছিল এমনি দর্পণে।

সকালে আদেশনামা এল—যেখানে যাবে সঙ্গে থাকবে অহল্যা। পিতৃহীনাকে নিজের শ্রমে মানুষ করেছি। আমার দাবী সর্ব ঊর্দ্ধে। আমি মা।

সন্ধ্যায় হাজির হল মরাল—"বড় সুখী হলাম, পদ্মিনী। এই ধরো মুক্তোর মালা। আমার ঠাকুরমা'র আশীর্বাদ।"

গলার পাশে হাত রূঢ় ভাবে সরিয়ে দিলাম মুক্তাহার সমেত—"সুখী হবার কিছু নেই। আমার মত নেই।"

"তার মানে? তোমার মা কথা দিয়েছেন। মাকে তোমার অমান্যের সাধ্য নেই।"

"মা মত দেবেন না তাহলে।"

মরালের মুখ বিকৃত হল, ছোট ছোট সাপের চোখে এল ইস্পাত—"তোমার মা মত না দিয়ে থাকতেই পারেন না। তিনি যদি মত না দেন, তাঁর সর্বনাশ হয়ে যাবে। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞাসা কোর।"

দূরে তালে, দূরে শালে বেজে উঠল অশুভ সঙ্গীত বাতাসের মর্ম-পীড়া। চমকে-ওঠা মনের অধরা তারে। যত অস্বস্তির ইঙ্গিত এত দিন বাঁধা ছিল, তারা মুক্তি পেতে চায় ওই দূর বাতাসের বিলাপ-কাতরতায়। মরালের কথা তারে ঘা দিয়েছে মাত্র।

মরাল বক্রহাসির সঙ্গে বিদায় নিল অনাদৃত মুক্তাহার নিয়ে। আমি কিন্তু মায়ের কাছে ছুটে জিজ্ঞাসা ক'রে নিতে পারলাম না। তিনি যে আমার পর। এই বলে নিজেকে ভোলালাম, হয়তো মায়ের ঋণ আছে মরালের কাছে। শোধ দিতে হবে আমাকে।

তিনি যে নিষ্ঠুর বুঝেছিলাম। প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় মায়ের নিষ্ঠুরতা ক্ষণে ক্ষণে প্রতিভাত হত অতর্কিত শৈথিল্যে। তাঁর কাছে

করুণা নেই, তা-ও জানতাম। মরালকে বিবাহ করতেই হ'ত। কুঁড়ে ঘরের ইতিবৃত্ত গতিবেগ বৰ্দ্ধিত করেছে সংকল্পের।

কল্লোল হয়তো প্রতীক্ষা ক'রে চলে যায়। হয়তো সে আমাকে ভুল বোঝে। কিন্তু, অহল্যার পাহারা আমাকে বেঁধে রাখল। খালের ধারে হয়তো যেতাম। দূর থেকে দেখতাম তাকে, যে আমাকে নবজন্ম দিয়েছে।

আবার নেমেছে বর্ষা গিরিসানু ছেয়ে। জম্বু বনে ঘনিয়েছে শ্রাবণের মেদুর মেঘসঞ্চয়। দশার্ণ গ্রামের গলিত মৃত্তিকায় জনপদবধূর অলক্ত-চিহ্ন। কুর্চি ফুলের ঝরা দলে দলে পিয়াসী ভ্রমর।

রাঙা মাটি গলিত হয়েছে ধারাপাতে। পাহাড়ে খসে যাচ্ছে শিলার ঝুরো মাটি। খালের জল বেড়ে উঠেছে গৈরিক আবর্তে আবর্তে। শ্যামল গাছের ঝরোকায় উঁকি দিয়ে আমাদের নিরালা বাড়িটি যেন ভীতি-স্তম্ভিত হয়ে আছে। সন্ধ্যার অন্ধকার বয়ে এনে দিল একখানি চিঠি গোপনে আমার হাতে। বাড়ির ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কাল চাদর ঢাকা ছোট ছেলে একটি দিয়ে গেল মুক্ত পৃথিবীর লিপিপ্রণয়।

'পদ্মিনী, অহল্যার পাহারা এড়িয়ে দেখা করা অসাধ্য বুঝেছি। এমনি ভয় ছিল আমার। তোমাকে বিনা অনুমতিতে চলে আসতে হবে। চিঠির উত্তর কাল আনতে লোক যাবে। কল্লোল।'

মনে হয়েছিল ঃ বন্ধ দরজা বিদীর্ণ ক'রে প্রচণ্ড জলকল্লোল ভাসিয়ে দিল আমাকে। বৃষ্টির ধারায় বেজে উঠল মুক্তি-সঙ্গীত। আমি যার, সে আমাকে চায়।

চিঠির উত্তর পাঠালাম। ঘরে পা দিয়ে শুনলাম ধাতব কণ্ঠ, "তুমি কি চাও মরালের ভোজপুরী দরোয়ান তোমাকে পাহারা দিয়ে রাখে?"

অহল্যা ক্রূর হাসিভরা মুখে স্খলিতদন্ত উচ্চারণে বলল, “চিঠি লেখা কেন ? কল্লোল বাবুর ছোকরা চাকর আচ্ছা চালাক আছে। মুখে বললেই হত।”

দাসীর আস্পর্দ্ধায় ক্রুদ্ধ দৃষ্টি তুলেই দেখলাম মায়ের দুটি চোখ—মিলে গেল দৃষ্টি। অদৃশ্য হিম-শলাকা হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ ক’রে দিল আমার। সে চোখ মানুষীসম্ভব নয়। পুঞ্জীকৃত পশুত্ব চীৎকার ক’রে উঠছে চোখের নিমেষপাতে, ‘দরকার হলে আমি সবই করতে পারি।’

ইনিই আমার মা! বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম। পশুত্ব-প্রস্ফুট চোখ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগল প্রেতের মত। কি রহস্য যেন সমগ্র বাড়ির অণু-পরমাণু-প্রবিষ্ট হয়ে আমাকে অস্বস্তির নাগপাশে বেঁধে ফেলর্তে চায় ?

একটু পরে মা নিজে আমার ঘরে এলেন। তাঁর পক্ষে এটি ব্যতিক্রম। আমার শয়নাবস্থা লক্ষ্য ক’রে বিদ্রূপ-কটু স্বরে বললেন, “ধরাশয্যা নিয়েছ যে ? শরীর খুব খারাপ না কি ? এত দূর ?”

আমি নির্বাক্ হয়ে রইলাম বিতৃষ্ণার প্রাবল্যে। খাটের অতি কাছে ধাতব-ঝঙ্কারে ক্রুদ্ধ সর্পিণীর গর্জন শোনা গেল, “আজ রাত্রে মরাল এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছে। তার কথা শুনে তোমাকে চলতে হবে। কারণ, তোমার শারীরিক অবস্থায় বেশী দেরী চলে না। সে যদি তোমাকে—তোমাকে কোন রকম অন্তরঙ্গ অবস্থায় চায়, আপত্তি কোর না। তোমার ভবিষ্যৎ—”

আমি উঠে দাঁড়ালাম। পদতলের কাশ্মীরী গালিচায় ঝরে পড়ল আমার অবরুদ্ধ অপমানের অশ্রুকণিকা, “আপনাকে শেষ বারের মত বলছি, কল্লোল কিছু করেনি।”

"আমিও শেষ বারের মত বলছি, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

গমনশীলার পথরোধ করলাম শেষ চেষ্টায়, "যদি আপনার সেই বিশ্বাস, তাহলে কেন কল্লোলকেই—"

"হতে পারে না। এ কথা তোমার মুখে আবার শুনলে আমি তোমাকে শক্ত শাস্তি দেব। তোমাকে তৈরি করা হয়েছে ধনীর ঘরের যোগ্যতায়।"

অদৃশ্য হয়ে গেলেন কঠিনা। নিষ্ফল আক্রোশে আয়নার গায়ে আঘাত দিলাম রৌপ্য-চিরুণীর। দ্বিতীয় চিতোরের যুদ্ধ নাকি পদ্মিনীর জন্য?

আহারাদির অন্তে মরাল অনুরোধ জানাল, "একখানা গান শোনাও, পদ্মিনী!"

নির্লিপ্ত ঔদাস্যে অর্গানে বসলাম! সযত্নরচিত নির্জনতার মধ্যে কথার চেয়ে নৈর্ব্যক্তিক সঙ্গীত ভাল—অনেক ভাল।

যন্ত্রসঙ্গীতে আর্তনাদ করে উঠল আমারি বিরুদ্ধ অন্তর। গানের কথায় বলে দিলাম ঃ

ভ্রমর, তুমি পদ্মিনীর কাছে নও। তবু, তোমাতেই আবদ্ধচিত্তা সে। স্রোতশিহরণে শফরী তার মৃল চায় উৎখাতিত করতে। সে তবু একে বদ্ধচিত্তা। ভ্রমর, তুমি কি কুঞ্জবিতানে পথ হারিয়েছ? পীতমধু পুষ্পের রেণু কি তোমার কাল চোখ অন্ধ করে দিয়েছে? তুমি কি বোঝ না পদ্মিনীর প্রাণ কোথায়? ক্ষুব্ধ বারিবীচিভঙ্গ কি তোমার দেশে কল্লোল তোলে না?

গান আমার প্রাণের বাণীরূপ। বর্ষার দিন কুয়াশাগুণ্ঠনে নিস্তব্ধ

হয়ে শুনে নিল ! শুনে নিল গৈরিক, উত্তাল খালের জল। তারা আমাদের দু'জনের সাধারণ সম্পত্তি। কল্লোল কি জানবে না আমার অসহায় অপেক্ষা ?

মরাল ততক্ষণে অতি কাছে এসেছে। ভারাতুর, বিধুনিত তার নিশ্বাস গ্রীবাপ্রত্যন্তের গুচ্ছ অলকে লাগছে আমার। গান বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়ালাম।

মাংস-পোলাউ পর্যাপ্তাহারে তৃপ্ত মরাল শেঠ কুহুরাত্রির অভিসার ইঙ্গিতে চঞ্চল। আমার দুই হাত সে ধরল অধিকার গ্রহণের ভঙ্গীতে।

আমি নীরবে হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলাম। মরালের ময়াল সাপের মত লিক্‌লিকে দীর্ঘ শরীর বেঁকে এল কানের কাছে, "কেন লজ্জা করছ, পদ্মিনী ? আর ক'দিন পরেই তো এক বিছানায় শুতে হবে ?"

"লজ্জা নয়, মরাল বাবু, ঘৃণা। আপনার ভুল হয়েছে। আপনার কাছে থাকার চেয়ে পদ্মিনীর জহর ব্রত ভাল।"

"বড় দেমাক তোমার। রূপ আছে, তাই বলে নিজেকে চিতোর-মহিষী মনে করার কারণ নেই। রূপ আছে বলেই তো চেয়েছি। নইলে, যার মা—। থাক, শোন পদ্মিনী, আমাকে তোমায় বিয়ে করতেই হবে। তোমার মায়ের শক্তি আমি জানি। অনর্থক ঝগড়া কোর না। আমি তোমাকে সত্যি ভালবেসে ফেলেছি।"

সারা পৃথিবী শিউরে উঠল। ভালবাসার নাম এত সহজে গ্রহণ ! অনুচ্চারিত নিষেধ বায়ুস্তরে মূর্ত হয়ে বাধা দিল—"Thou shalt not take the name of thy Lord God in vain !"

আমাকে গহন-সমুদ্রের অক্টোপাস্ ধরেছে—পিচ্ছিল মাংসপিণ্ড,

যার অভ্যন্তরে লালসার ক্ষণ-সন্তাপ নিরাকৃত হয় প্রাত্যহিক দিনযাত্রার জীবনীবিহীন শৈত্যে। যে মাংসপিণ্ড আত্মার দ্যুতিতে দেদীপ্য হয়ে ওঠে না, আমি তাকে নিয়ে কি করব ?

কঙ্কণের তীক্ষ্ণ কোণায় মরালের ভারী গণ্ডারচর্ম কেটে গেল। আমার হাতে সংযমী তারুণ্যের শক্তি ছিল।

মরাল আমাকে ছেড়ে পিছু হটে রুমালে গণ্ডের ক্ষত আবৃত করল। এক চোখ ঢাকা পড়েছে। অন্য চোখে হিংস্র আক্রোশ—"বেশ শিখেছ তো! ডাকব না কি মা-জননীকে ? হাণ্টার হাতে নিয়ে আসবেন, যেমন হাণ্টারের ঘা তাঁর নিজের পিঠেও পড়ে।"

"সাবধান আপনি, মায়ের সম্বন্ধে এ সব কথা বলবেন না। আমি তাঁকে বলে দেব।"

"ওঃ, ভয়ে ইঁদুরের গর্ত খুঁজি গে। যাও, যাও। আমার সামনে তার কথা বলার মুখ আছে ?"

"মিথ্যাবাদী, মা কাউকে ভয় করেন না।"

মরাল বসে পড়ল সোফায়, চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল, "সত্যি কথাটাই বলে যাই তাহ'লে ? ভেবেচিন্তে দেখে কাল মতামত স্থির কোর, বিয়ে করবে কি না! সতীকুলশিরোমণি তোমার মা। শিল্প-কেন্দ্রের টাকায় এই নবাবী চলে ? ওটা ছুতো মাত্র।"

বাতাসে বৃষ্টির শব্দ। ক্রন্দসীর অন্তরালে অকথিত যে রহস্য, মানুষের ভাষা তার প্রকাশ দেয়। মানুষের জীবনে নামে অন্ধকারের প্লাবন।

"শোন গরবিণী, বহুদিন থেকেই তোমার মা অবৈধ প্রণয়ে আনন্দ পাচ্ছেন। শিল্পকেন্দ্রের বেসাতি বিক্রীর ছলে কলকাতায় নাগরের কাছে যাওয়া! একমাত্র আমি জানি। তাই আমাকে সন্তুষ্ট রাখা

তোমার ও তোমার ওই মায়ের অবশ্য কর্তব্য।"

চীৎকার ক'রে উঠলাম, "মিথ্যা। আপনি কি ক'রে জানলেন?"

"আমিও যে একদিন একই হোটেলের বাসিন্দা হয়েছিলাম। পাশাপাশি ঘরের সব দৃশ্য দরজার ফাঁকে দেখা গিয়েছিল। পশুর মত তোমার মা আর সেই লোক উপভোগ করছিল পরস্পরকে।"

"ছি, ছি!" আমি মুহূর্তে মরে গেলাম—"টাকার জন্যে এই করতে হল মাকে?"

"না গো, না। টাকা নয় শুধু। তোমার মায়ের মধ্যে একটা পশুর দিক আছে, সেটা একমাত্র সেই পশু-প্রকৃতির লোক তৃপ্ত করতে পারে। মাঝে মাঝে সে চাবুক মারে—তাতে উনি আনন্দ পান। হোটেলের পরিচয়ের পরে সে ব্যক্তির যে ব্যবসা-সম্পর্ক হয়েছে আমার সঙ্গে।"

আমার আনত লজ্জাপীড়িত মুখের দিকে চেয়ে নরম গলায় এবার মরাল বলল, "মন খারাপ কোর না, পদ্মিনী! মানুষের মধ্যে পশু-প্রবৃত্তি থাকে। তোমার মায়ের মেয়ে তুমি। তোমার মধ্যেও সেই পশু আছে। আমি তোমাকে সুখী করতে পারব।"

কিন্তু আমি যে মানুষের দেবতার রূপও দেখেছি। আত্মসমর্পিতা নারীকে সে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। পশু ও দেবতা মানুষের মধ্যে পেলাম। কিন্তু, আমি যে দেবতাকেই চাই। জীবন-বীণার সরু-মোটা দুই তার। আমি সূক্ষ্ম সঙ্গীতের অপার্থিবতা চাই।

বলে দিলাম, "আমার মায়ের কথা আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করব না। তিনি সকল অবস্থাতেই আমার মা। আমার মধ্যে যদি পশু থেকে থাকে, সে পশুকে আমি হত্যা করব। আপনার সঙ্গে এই আমার শেষ কথা।"

মরাল অবশ্য ভবিষ্যতে আস্থা রেখেই চলে গেল। তারপরে বিপর্যস্ত আমাকে শাসন করতে এলেন—সেই মা।

দুই চোখে তাঁর জ্বলছে শুষ্ক বনের দাবানল—"সব শুনেছ, বুঝলাম। কিছু বলতে চাও?"

"না, না। আমি আপনার বিচার কোরব না।"

ধাতব-কণ্ঠে নির্লজ্জ ভাষণ হল, "আমার জীবন আমার নিজস্ব। তুমি শিশু, অনেক কিছুই বুঝবে না। ঐশ্বর্য আর শক্তির দাসত্বেই মেয়েদের সুখ। আমি ভুল করেছিলাম মিনমিনে গরীবকে বিয়ে করে।" ক্রুর, নিষ্ঠুর হাসি একটা খেলে গেল তাঁর কুঞ্চিত অধরে—"তোমাকে ভুল করতে দেব না।"

"মা, মা! চলুন, সব ছেড়ে দূরে চলে যাই। সেখানে মরাল থাকবে না।"

"মরালকে আমি ভয় করি না। কারণ, আমি যা করছি, তাতে আমার সাহস আছে। আমি চাই না শুধু আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোন অনুসন্ধান হয়।"

মা হঠাৎ চুপ ক'রে গেলেন। ছাই যেন কেউ তার মুখে মেখে দিল। ভাঙা-ভাঙা স্বরে বললেন, "একটা কথা প্রকাশ হলেই দশটা প্রকাশ হয়।"

আমার সর্বদেহে সন্দেহের বিদ্যুৎ খেলে গেল—"মা, আরও কি আছে?"

মুহূর্তে ঋজু হয়ে দাঁড়ালেন তিনি—"চুপ করো পদ্মিনী, বহু বাচালতা করেছ। এই মাসের শেষে মরালের সঙ্গে তোমার বিয়ে। আজ থেকে তুমি চাবী-বন্ধ ঘরে থকেবে।"

তবু বর্ষার ঝর্ঝর গানের অবিরত প্রবাহের মধ্যে, তবু শৃঙ্খলিত



ঘরের মধ্যে রাত্রির অন্ধকারে এল প্রিয়লিপি।

“পদ্মিনী, আমার চাকর সব খবর এনেছে। তোমাকে চাবি-বন্ধ ক'রে রাখা হয়। অহল্যা পাহারা দেয়। মরালের সঙ্গে তোমার বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে শুনছি বাইরে। চরিত্রহীন লম্পট সে। আমার চেয়ে উপযুক্ত পাত্র হলে আমি সরে যেতাম। যাই হোক, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। শুধু দরজা খোলা পেলেই চলে আসবে। খালের ধারে রোজ রাত্রে আমি থাকব। কল্লোল।”

আমার দায়িত্ব সে-ই নিয়েছে। আমি শুধু ডাকের প্রতীক্ষা করব। আকাশ ঢেকে ফেলেছে বর্ষাসমারোহ। এমন বর্ষা এ অঞ্চলে জীবনে নামেনি। পথ জলের আধার হয়ে দাঁড়াল। নেমে এল আকাশ মাথার ওপরে। আমার জীবনের বর্ষার সঙ্গে গেঁথে দিলেন প্রকৃতি তাঁর বর্ষা-চম্পূ। গদ্য ও পদ্যে গ্রথিত হল ছোট শহরটির দিনযাত্রা।

অবরুদ্ধা আমি চেয়ে থাকি লোহার গরাদের ফাঁকে দূরের রক্তিমাভ পথরেখায়। নির্জন বাড়ি পাহাড়তলীর। তাতে বৃষ্টির যবনিকা সম্পূর্ণ আবরণ ক'রে রেখেছে প্রতিবেশীত্ব থেকে। কেটে দিয়েছে বৃষ্টি-ধার ধারালো ছুরির ধারে যোগাযোগ ও আদান-প্রদান। আমার বন্দিত্ব লোকলোচনের অন্তরালে রইল। নিষ্ফল প্রতিবাদ রইল ঘুমন্ত মনের শীতল গহ্বরে।

আমার শুধু পথ চাওয়া—বিরহিণী যক্ষপ্রিয়ার পুষ্প দিয়ে দিবসের গণনা নয়—বিনিদ্র রাত্রে পূর্বতন সম্ভোগস্মৃতিচিহ্নিত জাগরণ নয়। আমার সমগ্র জীবন ধসে পড়েছে আমারি মাথার ওপরে। ভগ্ন ইমারতের নিচে প্রোথিত আছি আমি। আমার ব্যথা কারুকে বলবার নয়। আমার মাতৃত্বসম্পর্কহীন জন্ম হ'ল না কেন?

রামগিরি পাহাড়ের প্রাবৃট ঘনিয়ে এসেছে আধুনিক ভূভাগে।

স্তিমিতদিবা জ্যোতিহারা ইন্দ্রনীল মেঘমণ্ডলে। আবার ঝরে যাচ্ছে কুর্চিকেশর, আবার বকুলবিস্তৃত শ্যামতৃণে সঞ্চরণ করছে জলজ কীট। পথ নির্জন। পৃথিবীর মুখে চিররাত্রির তমসা।

আমার জীবনের বিশিষ্ট দিনগুলি এমনি বর্ষাব্যাকুল। বিস্ময়বোধ হয়, বর্ষায় গাঁথা জীবন আমার।

সেই বর্ষা-মাথায় নবীন পশারী এল—"পেঁপে রাখবেন, বহিন?" অহল্যা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। মা দোতলায়। আমি আমার একতলার ঘরে বন্দী ছিলাম। জানলা দিয়ে দেখা যায় ঢাকা রোয়াক।

"দূর দূর! এমন বর্ষায় পেঁপে খায় কে?" অহল্যা তাড়া দিল। শক্ত-সমর্থ রুক্ষ মজতুরী চেহারা পশারীর। বর্বর মুখে নির্লজ্জ স্পর্দ্ধা। কোথায় যেন মরাল শেঠকে মনে করায়!

চাপা-গলায় পশারী অহল্যাকে বলল, "বর্ষায় কি খায়, তা আমি জানি, পিয়ারী। দেহাতী লোকের দোষ নিও না।"

অহল্যা চটে উঠেই চুপ ক'রে গেল। পশারী বজ্রমুষ্টিতে হাত ধরেছে ওর—"আরে কর কি? জোরে কথা বোল না। লোকে শুনবে। পরদেশী, জরু নেই কাছে। এমন বর্ষা নেমেছে। তাই বেসামাল কথা বলে ফেলেছি।"

স্খলিতদন্তা প্রৌঢ়া অহল্যা—কৈকেয়ীর দাসী কুঁজী মন্থরা ওর তুলনা। তরুণ পশারীর ছোঁয়ায় এলিয়ে গেল। আমি ছিলাম বদ্ধ জানালাব আড়ালে। চার দিকে চেয়ে বলল, "আর ভাই, এখন কি বয়স আছে? আগে রোজ এক-একটা মরদ রাখতাম ঘরে। মাইজী এতে মানা করেন না।"

"আরে রাখ তোমার ছেনালী। বয়স কি হয়েছে আর? জান না, বুড়ো হাড়ে যূষ বেশী? আজ রাত্রে আমি তোমার মরদ হই না

কেন? এমন বর্ষা তো ঝুট্‌মুট্‌ কাটানো চলে না। আমার তাগদটা দেখো একবার।"

কুৎসিত ভাষায় কুৎসিত প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষরিত হয়ে গেল। আমি সেই ভাবে বসে রইলাম। সারা বাড়ির কামদিগ্ধ বীভৎস আবহাওয়া বুকে পাথর হয়ে শ্বাসরোধ করতে চায়। মাতার পরিচয় পেয়েছিলাম। দাসীরও যথার্থ রূপ দেখলাম।

এই তামসিক পশুত্বের সাধনায় আমি চাই তাঁকে—সত্য, শিব, সুন্দরকে। আমার ধারণার লক্ষ্য অমৃতের নিরূপক প্রেম। আমার জীবন-বীণায় মোটা তার বাজবে না।

রাত্রির গভীরতায় বর্ষাবিহ্বল নির্জনে খুলে গেল আমার বন্ধ দ্বার। পশারী কল্লোলের প্রেরিত কৃষাণ একজন।

অতি নাটকীয় কাহিনীর শেষ অঙ্ক মিলে গেছে সহজ আখ্যানে। কল্লোলের প্রসারিত বাহুর আশ্রয়ে তার বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে ভেবে-ছিলাম তাই। কিন্তু, নাটক ছিল জটিলতর।

কল্লোলের বাবা অদ্ভুত চোখে তাকালেন। বিতৃষ্ণ গলায় বললেন, "বিষকুম্ভ বাড়িতে আনলে তো?"

আমাদের যুগপৎ বিস্ময়কে অতিক্রম ক'রে কল্লোল বলে উঠল, "ও কি বলছো বাবা? পদ্মিনী না তোমার বন্ধুর মেয়ে?"

"তাই তো বলছি, তাই তো বলছি, বাপু। যাক গে, যা খুশী করো তোমরা।"

আমার পাদধূলিগ্রহণ-প্রয়াসে বৃদ্ধের নিদ্রা ব্যাহত হয়েছিল। ছিন্ন সূত্র ধরে ঘুমের দেশে চলে গেলেন তিনি আবার।

মাথা নামিয়ে বললাম কল্লোলকে আমার পরম গ্লানির ইতিহাস। আমার মায়ের কলঙ্ক। তার অগাধ প্রেম পঙ্কে-জাতা বলে পদ্মিনীকে

দায়ী করল না।

সেদিনও তেমনি বর্ষা-রাত্রি—কুঁড়ে ঘরের তেমনি মোহময় নৈকট্য। দুইটি সত্তা নির্জন গৃহে—একটু দূরে শয্যার প্রলুব্ধতা। ওখানে শেষ হয়ে যাক না দ্বৈতবোধ? কমলিনী যদি সমুদ্রে আশ্রয় পেয়েছে, তবে ভাসিয়ে নিক না সমুদ্র তাকে সীমিত বন্ধন থেকে? এ তো আমার পশুত্ব নয়—আমার দেবতার পূজা-প্রয়াস।

আমার বিহ্বল মুখের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি রেখে উঠে গেল কল্লোল দরজার কাছে। গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ভেসে গেল বর্ষণমত্ত বাতাসে।

"পদ্মিনী, আজ ঘুমোও। কাল বিয়ের ব্যবস্থা কোরব।"

"তুমি যেও না, কল্লোল। আমার যে ভয় করবে।" গমনমুখী দেহ তার জড়িয়ে ধরলাম। বাতাসের মত্ত আক্ষেপ, শালের উচ্চ বিলাপ আমার বুদ্ধি ভ্রষ্ট করেছিল।

জননীর সকরুণ স্নেহে দু'খানি কঠিন বাহু আমাকে ঘিরে ধরল। ভীত দেহ স্নিগ্ধ ক'রে পিতৃ-স্নেহের মাধুরী নিয়ে নেমে এল ললাটে একটি চুম্বন।

"পদ্মিনী, আমি একজন ঝি এনে রেখেছি। সেই তোমার ঘরে থাকবে। জীবনে পশুত্ব দেখে আঘাত পেয়েছ। আমি তোমাকে মানুষের অন্য পরিচয় দেখাব। তোমার পায়ে তো আত্মসমর্পণ করেছি। তাতেই আমার সুখ।"

কল্লোল চলে গেল আমার অধর স্পর্শবিহীন রেখে।

প্রাণসরস্বতী সহাস্যে সরু-তারে স্পর্শ করলেন।

কিন্তু হায়, এ জীবন তো ওখানেই বর্ষা পার হয়ে এল না। সেদিন মত্ত প্লাবন জেগে উঠল সময়-সাগরে। ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমার

পায়ের নিচের মাটি। সেদিন শালে-তালে-তমালে বাতাস নৃত্য ক'রে গেল তাণ্ডব নটরাজের। সেদিন দিগন্তে জেগে উঠল প্রলয়ের ইঙ্গিত।

মধ্যরাত্রে ঘা পড়ল সদর দ্বারে—"দরজা খোল, দরজা খোল।" বর্ষাধারাকে অবজ্ঞা ক'রে এসেছে কারা? এমন ক্ষিন্না পৃথিবীর তুহিন-নিথর রাত্রি! পথচারী কি ভয় পায়নি?

দেখলাম মা দাঁড়িয়ে আছেন। অহল্যা ও দারোয়ান সঙ্গে। জানলার কাছে কল্লোল এগিয়ে এল।

"দরজা খোল। আমার মেয়েকে চুরি ক'রে এনেছ, নির্লজ্জ? আমার ঝিকে ঠকিয়েছ। সহজে দরজা না খুললে মরালের বন্দুক নিয়ে লোক আনাব।"

নিরুত্তাপ কণ্ঠে কল্লোল বলল, "বন্দুক আমারও আছে। গেটের সীমানা মরাল পার হতে পারবে না। আপনার মেয়েকে আপনি অত্যাচারে পাগল ক'রে দিয়েছেন। লজ্জা আপনারই হওয়া উচিত।"

"তুমি ভেবছ ওকে তুমি পাবে? গেঁয়ো চাষা একটা! আমি থাকতে তোমার আশা পূর্ণ হবে না। ভাল চাও তো, দরজা খোল।"

"দরজা খুলছি। কিন্তু, আপনি ছাড়া কেউ ঢুকতে পাবে না আমার বাড়িতে।"

কল্লোল অগ্রসর হয়ে যেতে হাত ধরলাম আমি, "না, কল্লোল, খুলো না।"

হঠাৎ পেছনে দেখলাম, ঝিএর কাঁধে ভর দিয়ে অথর্ব বৃদ্ধ এক অঙ্গে নির্ভর ক'রে উঠে এসেছেন। মুখে তাঁর বাতুলভাব প্রকাশ।

"দূর হ, এখান থেকে। দরজা খুলে দাও, কল্লোল। ওর অষুধ আমার হাতে আছে।"

"তুমি কেন, বাবা? ঘরে যাও। যা করবার আমি করছি।"

"না, না। অনেক দিন চুপ করেছিলাম। আজ এই স্ত্রীলোকটাকে আমি দেখে নেব। দরজা খুলে দাও। মা, তুমি আমার পাশে এস। ভয় নেই।"

আমি কল্লোলের বাবার পাশে দাঁড়ালাম। দরজা খোলা হল। একা মাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এল কল্লোল। ওরা বাইরে রইল।

বর্ষণসিক্ত বস্ত্র মা পরিবর্তন করলেন না। ক্রোধে কুটিলা সর্পীর মত তিনি আস্ফালন করছেন। আমার চুলের মুঠি ধরলেন চেপে,— "হতভাগী, জেনে রাখিস, তোর নিস্তার নেই।"

কল্লোল ছাড়িয়ে নিল আমাকে। পক্ষাঘাতহত বৃদ্ধ থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠলেন। চীৎকার করে বললেন, "তুই কি ভেবেছিস, কুলটা? বিধবা হয়ে ভাবছিস আপদ গেল, না? তুমি বাচ্চা মেয়েটাকে বোর্ডিং-এ রেখে স্বামীর চোখে ধূলো দিয়ে উপপতির সঙ্গে উপভোগ করতে। সবই আমি জানতাম।"

"চুপ করুন আপনি। নিজের মেয়েকে আমি শাসন করতে এসেছি।"

"তোমাকে শাসন কে করে, শুনি? এত বছর চুপ ক'রে আছি, পক্ষাঘাতে ঘরে পড়ে মরছি। তাই ভেবেছ সব ভুলে গেছি, না? আমার ছেলেকে তুমি শাসাও? স্বামী থাকতে সুবিধা হচ্ছিল না। তাই বিষ দিয়েছিলে তার রাত্রির দুধে। কি না আমি জানি? ড্রাই কলেরাই বটে!" বৃদ্ধ আমার বুকের মধ্যে কাঁপিয়ে অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন। পায়ের নিচের ভূমি বিদীর্ণ হয়ে গেল। বসে পড়লাম আমি।

সেই নারী উঠে দাঁড়াল, যাকে আমার মা বলে ডাকতে হয়— "কোন প্রমাণ আছে?" ভয়ানক হয়ে উঠল মুখচ্ছবি তার। পশু

জেগে হানা দিল উগ্র চোখের তারায়। প্রবুদ্ধিত হয়ে উঠেছে সত্তায় তার পশুত্বের আত্মা।

"প্রমাণ এখন তোমার ওই মুখ। সেদিন হঠাৎ গিয়ে। পড়েছিলাম শুনলাম খুব অসুখ তোমার স্বামীর। তখনি প্রায় গতাসু হয়ে পড়েছিল সে। অথচ, ডাক্তার আসেনি। আমার অনুযোগে বিব্রত হয়ে অহল্যাকে ডাকলে তুমি ডাক্তারবাড়ি যাবার জন্য। অহল্যা জানত না যে আমি এসেছি। একটা কাচের গ্লাস ছাই মাখা অবস্থায় হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল। দু'জনেই ফ্যাকাসে হয়ে গেলে। দৌড়ে বেরিয়ে গেল অহল্যা। 'গেলাসটা দেখি', বলে আমিও ছুটলাম ওর পেছনে রান্নাঘরে। আমি দেখবার আগেই ধুয়ে ফেলল গেলাস সে। তুমি ছুটে এসে আলমারীর পাশ থেকে বিদ্যুৎবেগে তুলে নিলে একটা অতি ছোট ভাঙা শিশি। তোমার হাত ধরবার আগেই ছুঁড়ে দিলে পুকুরে। সমস্ত প্রমাণ লুপ্ত হয়ে গেল। ডাক্তারের সাধ্য ছিল না বিষ ধরার। সে এল অনেক পরে। তখন শেষ হয়ে গেছে।

কিছু কাউকে বলিনি। তোমার স্বামী ছিল বন্ধু। মেয়েটা তার রয়েছে। রয়েছে অকলঙ্ক নামের মহিমা। তাছাড়া, প্রমাণ ছিল না কিছু, পোষ্ট-মর্টেমে পাওয়া যেত না হয়তো। তুমি অস্বীকার করলে গ্লাসে বা শিশিতে বিশেষ কিছু থাকার কথা। দ্বিধায় ফিরে এলাম নীরব হয়ে। কিন্তু, বুঝলাম ধীরে ধীরে তোমাকে ভাল ক'রে দেখে যে তুমিই প্রাণহন্ত্রী।"

সেই নারী ক্রুদ্ধ হায়েনার মত দন্ত উদ্‌ঘাটিত ক'রে হিস্‌হিস্‌ স্বরে বলে গেল—"এর ফল পাবে। আমি বেঁচে থাকতে তোমার ছেলের রক্ষা নেই।"

টিলা থেকে নেমে খালের গৈরিক আবর্ত পার হয়ে ঘাতিনী চলে

গেল বর্ষার আচ্ছাদনের নিচে। পাশে প্রেতিনী অহল্যা। রাত্রি একটা বেজে গেছে। আমার ছোট জগৎ ভূমিকম্পে মূলহারা হয়ে পড়ল। হয়ে পড়ল বিশ্বাস চিরমৃত। ভয়ের শিহরণ পাঁজরায় কম্পন আনল আবার। মা বেঁচে থাকতে কল্লোলের রক্ষা নেই।

কিন্তু খালের জলে গৈরিক আবর্ত প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল অবিরত বর্ষার বিক্ষোভে। পাহাড়ে উৎস তার—স্ফীত নির্ঝরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নানা সঙ্গমকামা পরিবর্দ্ধিতা ধারা। সাগর চাই তাদের। পথের কোন বাধা মানবে না একত্রীভূত উচ্ছৃঙ্খল পার্বত্য প্রবাহ।

সেদিন খালের জলে জেগে উঠল পাহাড়িয়া ঝরণা। পাহাড় চূর্ণ ক'রে, প্লাবিত ক'রে তটভূমি, ঝাঁপিয়ে পড়ল সমতলে। টিলার পাশে সেই আমার বাড়ি ভেসে গেল নিশ্চিহ্নে।

আমরা ছুটে গিয়েছিলাম খবর জেনে। পূর্বের রক্তমেঘে প্রভাতী সূর্যের ছোঁয়া লেগেছে। সেই বাড়ির কোথাও চিহ্ন নেই? ভেসে গেছে মানুষের ঘর, মানুষের তৈজস। খরবেগ স্রোত মৃতদেহ টেনে নিয়ে শত শত যোজন দূরের খাদে ফেলে দিয়েছে। ভেসে গিয়েছে মানুষের পাপ। বর্ষণক্ষান্ত আকাশে এত দিন পরে উঠেছে ইন্দ্রধনু।

আমার জীবনের চরম বেদনা, পরম কলঙ্ক তো ওখানেই শেষ হল। বর্ষা আমাকে এনে দিল সুস্থ জীবনের ভরসা। কিন্তু সে যে নিল, অনেক নিল। যেখানে আমার ব্যথা, সেখানেই যে প্রাণস্পন্দন আমার। যেখানে আমার বিষ, সেখানেই আমার মধু। যে ভেসে গেল, সে যে আমার সকলের বড় আত্মীয়। সে যে আমার মা।

আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম হাহাকার ক'রে। ধুলো থেকে কল্লোল আমাকে বুকে তুলে নিল।

তারপর কেটে গেল বহু দিন। আসানসোলের ফার্মে আছি ভদ্র কৃষকের সোহাগিনী ঘরণী হয়ে। জীবনের তারে সূক্ষ্ম সঙ্গীতের অনির্বচনীয় মাধুর্য আমার দিনযাত্রায় এনেছে প্রশান্তি।

তবু তো আকাশ ভেঙে নেমে আসে বর্ষাধারা। প্রাবৃটের দিনে ফিরে আসে জীবনের বর্ষার দিনগুলি। মনে রাখার সাহস নেই, ভোলাও অসাধ্য।

কল্লোল বলে দেয় ছেলে-মেয়েকে, "ওরে তোরা এমন বর্ষার দিনে তোদের মাকে ঘিরে বসে থাকিস।"

ছেলে-মেয়ে জড়িয়ে ধরে থাকে। তাদের মাথায় হাত রাখি। এমনি নিবিড় বাৎসল্যের মুহূর্তে, যাঁকে ভুলতে চাই, তাঁকেই মনে পড়ে বার বার।

পচা আপেল

একটা বিয়ে-বাড়ি গিয়েছিলাম। এরকম অনেক বিবাহ-বাটি আমাদের যেতে হয়। অতএব গল্পটি বিয়ে-বাড়ির নয়, বর-কনের নয়, এমন কি ঔদরিক বৃন্দ নিরাশ হ'বেন, ভোজের বর্ণনা নয়। গল্পটি সেই বিবাহ-বাড়ির কোন একজন মানুষের কথা।

বিবাহ-বাড়িতে একটি মহিলার ওপর চোখ পড়ল। ছোটখাটো চেহারা। রং ফর্সা না হ'লেও একটা মসৃণ উজ্জ্বলতা আছে। গোল-গাল নরম গঠনের তরুণী। এখানে ওখানে ঘুরে ফিরে কাজকর্ম করছিলেন। মনে হ'ল হঠাৎ, একটি গোলগাল রসালো আপেল।

পরিবেশন করছেন ভদ্রমহিলা পরিবেশকদের হাত থেকে পাত্র কেড়ে নিয়ে। ব্যস্ত-ত্রস্ত গতি, যেন একটি আপেল গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে। প্রায় নিরাভরণ দেহ, কালশাড়ি, শাদা জামা, বেশভূষা বিলাসী নয়, সৌখিন মাত্র। মুখভাবে বিষণ্ণ মৃদুতা।

একটু বিশেষত্বমণ্ডিত মনে হ'ল ওঁকে। কৌতূহলবোধ করলাম। সরু বেঞ্চ পেতে খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রসনাতৃপ্তিকর ভোজ্য বস্তুর আস্বাদনে তৃপ্ত আমি মহিলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম পাশের বউটিকে। কারণ, পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে উক্ত মহিলা একটু আগেই কথাবার্তা বলছিলেন।

"উনি এই বাড়ির বৌ। স্বামী কলেরা হয়ে মারা গিয়েছিলেন মফস্বলে টুরে যাবার পথে। বৌটি যৌবনে যোগিনী হয়ে রয়েছে।"

যোগিনীর মত ধরণ পরিলক্ষিত হ'ল না। অতএব জিজ্ঞাসা করলাম, "তার মানে ?"

"এই—শ্বশুরবাড়িতে পড়ে থাকে। কর্তব্য নিয়ে ডুবে থাকে। গোটা সংসার ওরই হাতে বাঁধা ।"

ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলে বলে কণিকার ইতিহাস জানলাম। শুধু অলস কৌতূহল নয়, দীর্ঘ মেনুর দীর্ঘতর আহার ব্যবস্থায় ভক্ষণের মধ্যে প্রচুর বিরাম। চিংড়ির মালাইকারির পরে রুইমাছ আসবার মধ্যে একটা ছোটগল্প লেখা যায়।

পার্শ্ববর্তিনী হাত ও পাত চাটতে চাটতে কণিকা খাসনবীশের গল্প আমাকে শোনালেন। কণিকা দূর সম্পর্কিত আত্মীয় পরিমণ্ডলের লোক হ'লেও যাতায়াত না থাকায় তার সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না।

কণিকা রূপসী না হ'লেও পিতৃ-গৃহের ধনপ্রাচুর্যে সম্পন্ন পরিবারে উপযুক্ত পাত্রের হাতে পড়েছিল। কপালগুণে বছর কয়েকের মধ্যেই

বৈধব্যযোগ প্রাপ্তি হ'ল। তরুণী বিধবা সম্পন্ন পরিবারে। লেখাপড়া বেশী শেখেনি। কাজ রইল না। পিত্রালয়ে মেয়ের আদর আছে। যথেষ্ট বড়লোক তাঁরা। মেয়ে কিন্তু মাঝে মাঝে যাতায়াত করা ভিন্ন পিত্রালয়ে কায়েমী হয়ে রইল না।

শোকদগ্ধ বুড়ো শ্বশুর-শ্বাশুড়ী বৃহৎ পরিবারের ভার ওরই হাতে তুলে দিলেন। বাধ্য হয়ে নয়, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে কণিকা কাজের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিল।

ভদ্রমহিলা বললেন, "বাপের বাড়ি থেকে কত নিয়ে যেতে চায়। ও মেয়ে দেখা ক'রে চলে আসে। থাকতে পারে না।"

বিস্মিত হয়ে ভাবলাম, এ যুগেও কি এমন আত্মবিসর্জন আছে? কোমল-রসালো তরুণী মেয়েটি; জীবন যে চিতাভস্ম-ধূসর দেখে বোঝাও যায় না!

কণিকা আমাদের কাছে এল পরিবেশনের পাত্র হাতে—"আর একটু মাছ?"

আমি চোখ তুলে তাকালাম। চোখাচোখি হ'ল তার সঙ্গে। উদাসীন দৃষ্টি তার, কোমল মুখের ওপর বিষণ্নতা। দৃষ্টির ঔদাস্যের নীচে বোধ হয় আর কিছুর অজানা অস্তিত্ব দেখলাম। মনের গভীর অতলে যা আছে, একান্ত গোপনীয় সে বস্তু সযত্নে চেপে রেখেছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'ল। পানের খিলিটি মুখে পূরব কিনা ভাবছি, অথবা লবঙ্গটাই খুলে নেব? একটি ছেলে ডাকল, "চিনতে পারেন?"

ছিপ্‌ছিপে ফর্সা চেহারার তরুণ। আত্মীয়তার সূত্রে ওর সঙ্গে দেখাশোনা—যাতায়াত মাঝে মাঝে হয়। এই বাড়ি ওর আত্মীয়-

বাড়ি জানতাম। আশ্চর্য হলাম না।

"খাওয়া-দাওয়া ভাল হয়েছে তো ?" হেমন্ত জিজ্ঞাসা করল।

"তুমি বুঝি তদারকে আছ, না ?"

হেমন্ত হাসতে হাসতে বলল, "হ্যাঁ, বিয়ের ব্যাপারে এখানেই কয়েকদিন থাকতে হচ্ছে। এঁদের কাজকর্মের লোক কম। একা-একা কণিকাদি আর কত পারবে ?"

কণিকাদির গুণমুগ্ধ ভক্ত ছেলেটিও দেখলাম। সত্যই মহিলার গুণবাহুল্য আছে! শ্বশুরবাড়ির লোকেরা অহেতুক বিধবা বৌ-এর প্রশংসা করে না।

আমি বললাম, "দেখছি তো তোমাদের কণিকাদি চারদিকে ছুটোছুটি ক'রে ব্যাপারটা সামলে নিচ্ছেন। আহা, এত অল্প বয়সে এমন দুরবস্থা! তবে শ্বশুর-শ্বাশুড়ী খুবই ভাল বলতে হবে। হিন্দু-ঘরের গোঁড়া বিধবাকে রঙীন শাড়ী পরিয়ে রেখেছেন। মেয়েদের মত মাথায় কাপড় না দিয়ে ঘুরে ফিরে উনি বেড়াচ্ছেন। সংসারের কর্ত্রী উনি শুনলাম। ভুলে যাতে থাকেন তেমনি চেষ্টাই হচ্ছে।"

হেমন্ত মুখ বিকৃত ক'রে বলল, "বিনে পয়সার দাসী পেলে কে ছাড়ে বলুন তো ?"

অবাক হয়ে গেলাম। কৈশোর সবে পার হয়েছে হেমন্তর। তারুণ্যের গগনে নবোদিত বালারুণ সে। আমাদের সঙ্গে সমীহ ক'রে কথা বলতে অভ্যস্ত। আজ বয়োঃজ্যেষ্ঠা আত্মীয়াকে সমর্থন করে এতটা উষ্মা তার বোধগম্য হয় না।

হাত-মুখ ধোবার জায়গায় আবছা আলো। হেমন্তর মুখ দেখা যাচ্ছিল না। ও আমাকে আহ্বান করল, "একটু বসবেন আসুন নিরিবিলি। বিয়ে এখনও সুরু হয় নি।"

নিমন্ত্রিতের ভিড় ঠেলে দোতলার একখানি সুসজ্জিত ঘরে বসাল সে আমাকে। কার্পেট বিস্তৃত মেজের ওপর প্রকাণ্ড জোড়া খাট, আয়নাদার আলমারী, ড্রেসিং টেবল ইত্যাদি সজ্জিত। হেমন্ত বলল, "কণিকাদির ঘর এটা।"

বিবাহের আসবাব এখনও সাজানো আছে, কিন্তু বরয়িতা কোথায়? জোড়া খাটে সুখশয্যা, পুরু বলিশ, ফর্সা চাদর। মনে হ'ল ঘরটি হেমন্তর প্রিয়। তাই এখানে বসবার আশায় সে আমাকে ডেকে এনেছে।

কণিকা এর মধ্যে ঘরে ঢুকল, লোহার আলমারী খুলে টাকাকড়ি বার ক'রে চাবী আঁচলে ঝুলিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসল, "হেমন্ত আপনাকে এখানে বসিয়েছে। কিন্তু আমার এমনি কাজ পড়েছে যে দু'দণ্ড বসে যে কথা বলব, তাও সময় নেই।"

আমি ভদ্রতা ক'রে বললাম, "আজ কি আর বসে কথা বলার দিন?"

"হ্যাঁ, দেখুন না, যেদিকে না যাব সেদিকেই অন্ধকার। আমাদের কথা সবই তো জানেন। দেখাশোনার লোক নেই আমাদের।"

কণিকার গলা যেন করুণ মূর্চ্ছনায় নেমে এল। উপযুক্ত স্বামীর স্মৃতি নিশ্চয় আজ তাব মনে প্রতিক্ষণ নিঃশ্বাস ফেলছে। পরিণয়ের আসরে মনে তার পড়েছে অন্য একটি দিন, যখন শানাই বেজে উঠছিল রক্তাম্বরা তাকে আহ্বান ক'রে নিতে।

হেমন্তকে বলে গেল কণিকা "ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বল। আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি। বিয়ে আরম্ভ হ'লো, আর তো আমাকে দেখতে নেই।"

আমার মন বিষাদে পরিপ্লুত হয়ে গেল। হেমন্ত কণিকার অন্তর্হিত

মূর্তির উদ্দেশে বলল, "এই ক'রে ক'রেই গেলে! এত সংস্কার কি ভাল?"

আমি বললাম, "সংস্কার হয়তো ওঁর নয়। অন্য লোকের সংস্কারকে উনি মেনে চলেছেন।"

হেমন্ত উত্তেজিত হয়ে বললে, "সারাদিন গাধার মত খাটবে। সকলের মন জুগিয়ে ভয়ে ভয়ে চলবে। অথচ ওর মুখের দিকে তাকাবার লোক নেই। যদি গোটা দিন না খেয়ে থাকে, খেতে বলবে না কেউ।"

আবার অবাক হলাম। কণিকার যা পরিচয় পেয়েছি একটু আগে পার্শ্ববর্তিনী নিমন্ত্রিত মহিলার কাছে, তাতে তার আসন এই বাড়িতে সুদৃঢ় বলে মনে হয়। তার গিন্নীপনা দেখলে অনুমান করা শক্ত যে তার আদর নেই।

হেমন্ত বলে চলল, "কত বড় ঘরের মেয়ে কণিকাদি! এখানেও স্বামীর টাকাকড়ি ওরই নামে। বেচারীর ভালমন্দ দেখবার কেউ নেই। জানেন আমি আছি তাই বেচারীর রাত্রে জল খাওয়া হয়। আমি মিষ্টি কিনে এনে লুকিয়ে ওকে জোর ক'রে খাওয়াই। ও আবার এমনি লোক যে নিজের জন্যে আলাদা কিছু করতে চায় না।"

"তবে এখানে পড়ে থাকেন কেন? বাবা-মায়ের কাছে গেলেই পারেন। আমার কিন্তু মনে হয়, যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে ওঁর শ্বশুর বাড়িতে।"

"তা আছে, কিন্তু এঁরা লোক ভাল নয়। কণিকাদির কর্তব্যবোধ খুব বেশী, তাই এখানেই থাকে। ছেলেমেয়েকে নিয়ে গেলে এ বাড়ির কষ্ট হবে কিনা। নিজেও ছেড়ে থাকতে পারবে না। তাই যায় না।"

মনে হ'ল রসালো আপেলের সঙ্গে কণিকা খাসনবীশের তুলনা

অন্যায় হয়নি। আপেলের মিষ্টি রস সে বিতরণ ক'রে চলেছে সংসার-চক্রে পিষ্ট হয়ে।

বাংলার মেয়ের মহিয়সী রূপ আমাকে মুগ্ধ করল। বৈধব্য তাকে দীনতা দেয়নি, মহিমা দিয়েছে। বিয়ের বাজনা বেজে উঠল। আমার ডাক এল। আমি চলে এলাম।

মাস দুই পরে একদিন অপরাহ্ণে হেমন্ত আমাদের বাড়ি এল। মাঝে মাঝে ওর আসা-যাওয়া ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করলাম।

বললাম, "কি হেমন্ত, কাজকর্ম কেমন চলছে?" কিছুদিন হ'ল হেমন্ত ব্যবসায়ে নেমেছিল। শুনেছিলাম সম্প্রতি মন্দা চলেছে। তারই ছাপ বোধ হয় ওর চোখে-মুখে।

বিবাহবাড়ির সেই উজ্জ্বল ছেলেটি কোথায় হারিয়ে গেছে? আমার সামনের এই তরুণ তার নিষ্প্রভ একটি প্রতিকৃতি মাত্র।

হেমন্ত আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। অন্যমনস্ক ভাবে সে কি যেন ভাবছে। ভাবলাম লোকসান বোধ হয় অতিরিক্ত হয়েছে।

একটু দ্বিধার সঙ্গে হেমন্ত বলল, "একটা টেলিফোন করব।"

"বেশ তো, কর না।" আমার টেলিফোন যন্ত্রটা পাশে ছিল, এগিয়ে দিলাম ওর দিকে।

হেমন্ত ইতস্ততঃ ক'রে বলল, "কণিকাদিকে ফোন করব।" অনেক-দিন পরে কণিকার কথা মনে পড়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি খবর ওঁর? বাপের বাড়ি গেছেন নাকি?"

"হ্যাঁ!" একটা অবজ্ঞার ভাব দেখিয়ে হেমন্ত বলে উঠল, "বাপের বাড়ি যাবে? তবেই হয়েছে!"

তরুণের দেশাচারের প্রতি অবজ্ঞা স্বাভাবিক। হিন্দু বিধবার কঠোর ভাগ্য আমাদের দেশের যুবকদের সমাজ সংস্কারে যদি অনুপ্রাণিত করতে পারে, মন্দ কি? তবে হেমন্ত কণিকার প্রতি অতিভক্তির আধিক্যে কণিকার শ্বশুরবাড়ির প্রতি অবিচার করছে নিঃসন্দেহে। কণিকাকে তাঁরা অনাদর করেন কিনা জানি না, কিন্তু কণিকা যে সম্পূর্ণ স্বাধীন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। স্বল্প দেখায়ও সেই তথ্য উদ্‌ঘাটিত।

হেমন্ত কেমন ইতস্ততঃ করতে লাগল। ভাবলাম, ও আমার সম্মুখে টেলিফোনে দ্বিধা দেখাচ্ছে কেন? যে রকম উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের মত চেহারা দেখছি, হয়তো কোন ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনী কণিকাদিকে জানিয়ে পরামর্শ প্রার্থনা করবে। আমার চেয়ে কণিকা ওর অনেক নিকট। কণিকার স্বভাব-মাধুর্য এবং হতভাগ্যের জন্য হেমন্ত কণিকার ভক্ত, আমি জানি।

"তুমি ফোন কর। আমি চা নিয়ে আসি।" সুযোগ দিয়ে ওকে আমি চলে গেলাম ঘর থেকে। বেশ একটু দেরী ক'রেই ফিরলাম।

"কি হেমন্ত, তোমার কণিকাদি ভাল আছেন?"

"ভাল থাকবে না কি? আহ্লাদে ডগমগ।" হেমন্ত যেন রাগে ফেটে পড়ল। শ্বশুর-শাশুড়ীর মুখের দিকে তাকায় না। ছেলের শোকে ওঁরা একেই ভেঙ্গে পড়েছেন।"

অত্যন্ত বিস্মিত হ'লাম। ইতিপূর্বে কণিকার শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে শ্রীমানের বিক্ষোভ শুনেছি। কর্তব্যপরায়ণা কণিকার শ্বশুরবাড়ির জন্য ত্যাগ স্বীকার শুনেছি। এখন উল্টো সুর শুনে চিন্তিত হ'লাম।

চা এল। অনাসক্তভাবে হেমন্ত চেয়ে দেখল, পেয়ালা তুলে নিল না। বললাম, "কণিকা কিছু বললেন তোমাকে?"

"বলবে আবার কি ? যা-তা বলল। আমাকে কতকগুলো কথা শোনাল। আমি—আমি ওর জন্যে কি না করেছি !"

হেমন্তের গলা ভেঙে গেল।

আমি বললাম, "তোমাকে কথা শোনাবার কারণ কি ?"

"আমি বিমলদার কথা বলেছি কিনা। আমার মাসতুতো দাদা। কি করব ? বিমলদার বৌ যে কান্নাকাটি করছে।"

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলাম, "বিমলদার বৌ কান্না-কাটি করছে কেন ?"

হেমন্ত যেন আর কিছু চেপে রাখতে পারছে না। মরীয়া হয়ে বলে উঠল, "বিমলদা যে দিনরাত কণিকাদির কাছে পড়ে রয়েছে। বৌদির কাছে আসছে না।"

"কেন ? তাতে কি হয়েছে ?"

সুস্পষ্ট অবজ্ঞার দৃষ্টিতে হেমন্ত আমার দিকে তাকাল, "আপনি লেখিকা হয়েছিলেন মিছেমিছি। স্বামী যদি অন্য মেয়েকে নিয়ে মেতে থাকে, স্ত্রীর কষ্ট হয় না ?"

"ওঃ!" এক মুহূর্তে চোখে ভেসে এল রঙীন শাড়ী, রসালো আপেলের কোমলতা, সযত্ন সুখশয্যা। বন্ধ্যা বৈধব্যের মূর্তি ওই মূর্তি নয়।

প্রশ্ন করলাম সাবধানে, "শ্বশুর-শ্বাশুড়ী জানে না ?"

"জানেন না আবার ? তাই ঘেন্নায় ওকে কিছুই বলে না।"

"ওকে এখানে রেখেছেন তো। সংসারও ওরই হাতে।"

"কারবারের অংশ ওর নামে আছে যতদিন ওর ছেলে নাবালক থাকবে। তাই নাতির সাবালক হওয়া পর্যন্ত ওঁরা সহ্য ক'রে যাচ্ছেন। সংসারের কাজ কণিকাদি সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে করে। ওঁরা বাধা দেন না।"

"এই সব কেলেঙ্কারী বুড়ো শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সামনে না ক'রে বাপের বাড়ি গেলেই হয়!"

"বাপের বাড়ি ও যাবে কেন? তাঁরা সেকেলে লোক। আর সে বাড়ি গেলে চলবে কেন? এ বাড়িতে বিমলদার মত বন্ধু আছে যে।"

আমি স্তম্ভিত হলাম, "বল কি?"

মনে ভেসে এল ঃ আপেলের ছবি। টুক্‌রি ভর্তি লাল টুকটুকে আপেল, রসে টস্‌টস্‌ করছে। হঠাৎ পাশ থেকে দেখা গেল, বিকৃত দাগ গায়ে। পচা আপেল।

তরুণের আদর্শবাদে আঘাত লেগেছে, ব্যথা পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বয়সে অতটা বড় নিকট-আত্মীয়ার নীতিবোধ নিয়ে হেমন্ত যেন অতিরিক্ত উত্তেজনা প্রকাশ ক'রছে।

ওকে শান্ত করবার আশায় বললাম, "যার যা খুশী করুক না। তুমি ভাল মনে শ্রদ্ধা দিয়েছিলে। ফুলে যদি পোকা থাকে, ফলে যদি পচন ধরে, তুমি কি করতে পার? তোমার কি?"

হেমন্ত লাফিয়ে উঠল, হাতের ধাক্কায় ওর চায়ের কাপ গড়িয়ে পড়ল টেবিল থেকে। মত্তভাবে পায়চারী ক'রতে ক'রতে চুল এক হাতে টেনে ধরে জ্বালা-ভরা দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে চাপা সুরে বলল, "আমার কি? আমার কি? গল্প লেখা ছেড়ে দিন। বোঝেন না কেন—আমার কি?"

চোখের সামনে আবার আপেলের ঝুড়ি ভেসে এল। এবার একটিও ভাল নেই। সমস্ত পচা আপেল!

হে মহানগরী

(মুখবন্ধ)

সমান্তরাল বারের খেলা নয়—সার্কাসের অভিনবত্ব নয়। সোজা ফাঁসির দড়ি গলায় দোদুল্যমান মৃতদেহ। বীভৎস, সন্দেহ নেই। বিশদ বর্ণনায় প্রয়োজন কি ? আপনারা তো সকলেই ক্ষুদিরাম অথবা অভিরামের ফাঁসির বর্ণনা পড়েছেন। ফাঁসিকাঠের রূপ ভাল ক'রেই আপনারা জেনেছেন। কেমন ক'রে হাড় ভেঙে গলা ঝুলে পড়ে, কেমন ক'রে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে, জিভ কতটা দেখা যায়—এই সব ঘৃণিত তথ্য আপনারা তো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ে গেছেন। একটা বিষধর সাপকে চলে যেতে দেখলে ঘৃণায় আপাদমস্তক শিউরে ওঠে, যাকে শুদ্ধ ভাষায় বলা হয় জুগুপ্সা। তবু নির্ণিমেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে ওই চলন্ত সরীসৃপের দিকেই, যতক্ষণ দেখা যায়।

ফাঁসির বর্ণনা ঠিক তেমনি, নয় কি ? ভয় থাকে, থাকে বিতৃষ্ণা, তবু কৌতূহলও জাগে পাশাপাশি। মনুষ্যত্বের ধ্বংস দেখে হতাশা—বেদনায় হৃদয় ভরে উঠলেও তীব্র কৌতূহল জয়লাভ করে। ফাঁসির বর্ণনা পেলেই অনুধাবন করি আমরা।

কিন্তু আমি গল্পের প্লটের অভাবে ফাঁসির গল্প চাই না শোনাতে। বেশ লাগসই হবে, জানি ; কিন্তু ইচ্ছা নেই আমার। বাংলা আজ শোকে-অভাবে জর্জরিত, তার মধ্যে আরও দুঃখ টেনে আনবার দরকার কি ? দরকার কি জীবনের মুমূর্ষু দিকের ছবি আঁকা ?

তবু আমাদের কর্তব্য আছে অনেক। আমাদের জানা উচিত

যবনিকার অন্তরালে থাকে কি। ক্ষুদিরাম, অভিরামের ফাঁসির মধ্যে দুঃখ নেই। মানুষ মরণশীল, একদিন তাঁরা মরতেন। যদি কিছুক্ষণ আগে মরে অমরত্ব লাভ করা যায়, তাহ'লে মন্দ কি? ফাঁসির দড়ি কুড়োবার উদ্দেশে হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে।

কিন্তু, একই মৃত্যু—কি নীরবে, কি অসম্মানের মধ্যে! কেউ জানল না তার কথা, কেউ তার নামে স্মৃতিসৌধ গড়িয়ে দিল না। একটি সাধারণ তরুণী। গলির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে। এমন মৃত্যু সে পেল কোথায়?

(ডলির বক্তব্য)

সত্যি, এত কি ছিল মেয়েটার পেটে পেটে! পাত্‌লা চেহারা, শ্যামবর্ণা, টানা-টানা চোখ, টিকোলো নাক। এমন বীভৎস একটা কিছু সে ক'রে ফেলবে কে জানত? অল্প কথা কইত, হাসত কম। অত চাপা লোকের মধ্যে এতও কি ছিল? লেখা-পড়া করেনি বেশি-দূর—আই. এ. পাশ ক'রে চাকুরি খুঁজে বেড়াত দিনরাত। পক্ষাঘাতে পঙ্গু বাবা—পেন্‌সনের সামান্য ক'টা টাকায় সংসার কি ক'রে চলত জানি না। মা বাতে শয্যাশায়ী। সংসারের যাবতীয় কাজ মেয়েটার ঘাড়ে ছিল। ভাই-এর মাথা খারাপ। ছোট বোন পড়ে ফ্রী স্কুলে। এমন নাটুকে কাণ্ড শেষে কিনা ওই করল!

চেহারায় বেশ চটক ছিল মেয়েটার। হাড়-বারকরা চেহারা হ'লেও মুখখানি ভারি সুন্দর ছিল। যেদিন একটু ভাল ক'রে পোষাক করত, সেদিন কি চমৎকার দেখাত! স্বভাবটাও তো মন্দ ছিল না। নম্র—ধীর, মুখে বড় কথাটি ছিল না। লোকের আপদে-বিপদে মেয়েটা বুক দিয়ে করত। কেন যে এমন প্রবৃত্তি হ'ল ওর?

(নীহারিকার বক্তব্য)

ছবির মত মনে জাগছে মল্লীর সঙ্গে শেষ দিনের দেখা। হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা আমার ঘরের দোর ধরে দাঁড়াল আবছা আলোয়। মুখ বিষণ্ণ, হাতের আঙ্গুলে লালপাড় শাড়ীর পাড় জড়ানো। চুলগুলো চোখে-মুখে পড়ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি মল্লী, কি দরকার?" হয়তো আবার ওর ঘরে চাল নেই। কিন্তু ও বলল, "না মাসীমা, কোন দরকার নেই। এমনি এসেছি। কি করছেন? স্কুলের খাতা দেখছেন নাকি?"

ঘরে বেলের মোরব্বা করেছিলাম, দিলাম একটু। মল্লী আস্তে আস্তে পাথরের বাটি থেকে তুলে খেতে সুরু করল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম চোখ ছল্‌ছল্‌ করছে। খাওয়া বন্ধ ক'রে আমার দিকে জলভরা চোখ মেলে চেয়ে রইল। অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, "ওকি মল্লী, কি হয়েছে? বীরেনের সঙ্গে ঝগড়া না কি?"

"না, না," বলে যেন শিউরে উঠল মেয়েটা। চোখের জল মুছে হঠাৎ আমাকে একটা প্রণাম ক'রে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। না-খাওয়া আধখানা মোরব্বা পড়ে রইল বাটীতে। তখন কি জানি ও আমার সঙ্গে শেষ দেখা করতে এসেছিল? এক পাড়ায় থাকত, এতটুকু বয়স থেকে দেখছি। সকলেই তো ভালবাসত। কাগজ খুলে ওর কাহিনী পড়ে আমরা অবাক হলাম। এতটুকু মল্লী, এমন নিষ্ঠুর হ'ল কি ক'রে?

(বীরেনের বক্তব্য)

গা জ্বলে যায় ন্যাকামি দেখে। চাকুরির লোভে হোড় সাহেবের সঙ্গে ব্যভিচার করেছে। আবার আমার কাছে সতী সেজে মন

ভোলাবার চেষ্টা। ঢের—ঢের দেখেছি, মল্লী দত্ত। হা-ঘরে মেয়ে, চালচুলো নেই। বাড়ির লোক কত বকতেন আমি মেলামেশা করতাম বলে। কিন্তু আমার কেমন একটা দুর্বলতা ছিল, স্বীকার করছি। মনে মনে জানতাম যে একদিন স্বাধীন হ'ব, যথেষ্ট রোজগার করব। তখন আমার ঘরে আসবে ওই মল্লী।

দিনের পর দিন এঁদো গলিতে মশার কামড় খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম ওরই আশায়। পয়সা বাঁচাতাম ইউনিভারসিটির বাস ভাড়া থেকে, চা না খেয়ে দোকানে। ওকে কিনে দিতাম সব দরকারী জিনিষপত্র। বিশ্বাস ছিল ও আমারই সম্পত্তি। এম. এ. পাশ ক'রে চাকুরী নিলেই ওকে পাবো।

শুধু ওকেই চেয়েছি। দিন চলে না ওদের, জানি। ও চাকুরি খুঁজে মরছে, জানি। নিজেও কি কম চেষ্টা করেছি ওর একটা চাকুরির সন্ধানে? কিন্তু, ভাগ্যে জুটে আসছিল না। অবশেষে জুটল কিনা মোটা বুলডগ হোড়? ছি, ছি, কি প্রবৃত্তি মেয়েটার! বন্ধুর মামা, সে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। গভর্ণমেণ্টের একটা বড় বিভাগের মাথা হোড় মশাই। ও যাতায়াত করতে লাগল চাকুরীর লোভে। আমি নিষেধ করিনি। কেনই বা করব? মল্লীর বাবার বয়সী, পঞ্চাশের ওপর বয়স। ঘরে স্ত্রী জলজ্যান্ত রয়েছে একটা।

আচ্ছা, হোড় না হয় বদমাইস। মল্লী কি ক'রে পারল? থ্যাবড়া বুলডগমুখো হোড়, মোটা মেদবহুল শরীর। চেহারার সঙ্গে মেষের সাদৃশ্য আছে। অতি স্থূলভাবের লোক, মুখের ওপর কে যেন দেগে দিয়েছে জঘন্য চরিত্রের ছাপ। বেশভূষার চটক কি! মোট্‌কার আবার বাটন-হোল-এ গোলাপ ফুল! এধারে লম্পট চূড়ামণি; অথচ কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য আওড়ানো চাই।

ধন্য মল্লীর পছন্দটা! আমাকে এতকাল খেলিয়ে না হয় মনে নাই ধরেছিল? তা' বলে, ওই বৃষভ?

সেদিন হোটেলে রাত্রে হোড়ের সঙ্গে খেতে গিয়েছিল। তা প্রায় মাস ছয় হবে। তারপর থেকেই যেন শ্রীমতীর কেমন কেমন! চাকুরির কথা জিজ্ঞাসা করলে বলেছিল, "না, ওখানে কোন সুবিধা হবে না।"

আশ্চর্য, সব মিথ্যা, এখন বুঝেছি। হোড়ের সঙ্গে আর সম্বন্ধ নেই, তাই বোঝাল। কিন্তু ওতো ছল। মুখে দেখাত যেন নিস্পৃহ, হোড়ের সঙ্গে চোখের দেখাটিও নেই। এধারে তলায়-তলায় চলত প্রেম। তাই আমার সঙ্গে ছাড়া-ছাড়া ভাব দেখতাম। পরীক্ষা নিয়ে ছাই এতই ব্যস্ত ছিলাম যে মল্লীর সঙ্গে দেখা করতেও যেতে পারতাম না। আর এক-আধ দিন যদি যেতামই বা সামান্য একটু সময়ের জন্য, কোন সুখ থাকত না সে দেখাতে। কেমন ফ্যাল ফ্যাল ক'রে আমার দিকে চেয়ে থাকত, কি যেন বলতে যেয়ে বলত না। মরা মাছের মত চোখের চাউনী হয়ে গিয়েছিল। হায় ভগবান, আমার সেই মল্লী এমন ক'রে বদলে গেল কেন? সবই হোড়ের জন্য।

তারপর জীবনে ভুলব না সেই সন্ধ্যা। অনেকদিন পরে চিঠি লিখে ডেকে পাঠিয়েছে মল্লী। গেলাম কত আনন্দে। যা বলল শুনে মাথায় আকাশ খসে পড়ল। আমার মল্লী মাতা হ'তে চলেছে! হোড় অবাঞ্ছিত সন্তানের জনক!

একবার বলতে গেল, "আমার কথাটা আগে শোন বীরেন, তারপরে বিচার কোর।"

পারলাম না সহ্য করতে, সহ্য করতে পারলাম না। চাপা গলায় বললাম, "লোভের বশে আত্মদান? সংসার চলছিল না, তাই এ-কাজ

করেছ, এই বলবে তো ? মরলে না কেন তুমি ?”

মল্লী দেওয়ালে মাথা হেলিয়ে অবসন্ন ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। পেলব তনুদেহ, কিশোরীর সরলতা কোমলতা এখনও মুখে-চোখে। ভগবান এতবড় বিষধরকে এমন মধুর আকৃতি দিয়েছিলেন কেন ?

সমস্ত বুক আমার জ্বলে যাচ্ছিল, বলে চললাম, “কি জন্যে আমাকে ডেকেছ শুনি ? আমার সঙ্গে তোমার সব শেষ হয়ে গেছে। হোড়ের উপপত্নীকে আমি চিনি না। লোভের বশে এত বড় অন্যায় তুমি করবে মল্লী, ভাবতেও পারিনি। ধর্ম-নীতি তো চুলোয় গেছে তোমার —যাক্। আমার কথাটাও কি মনে ছিল না তখন ?

মল্লী বুক-চেরা স্বরে বলে উঠল, “চুপ কর, বীরেন। আমি তো বলতেই চেয়েছিলাম, তুমি শুনলে না।”

“শুনবার কি আছে, মল্লী ? হোড়ের এখন শুনবার কথা আছে, আমার নেই। এ তো সামান্য হৃদয়ের দুর্বলতা নয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সন্দেহ-দ্বিধার পথ রাখনি তুমি।”

মল্লী একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল। অতীতের বিভ্রম ফিরে আসবার আগেই আমি নিজেকে ছিঁড়ে নিলাম। আমার জীবনের সুখ ঝরা ফুলের মত ধূলোয় খসে' পড়ল। কার জন্য ?

“চললাম মল্লী। আর দেখা হবে না। কার পাপে এমন হল জানি না।”

মল্লী অস্ফুট স্বরে বলল, “আমি জানি।”

“জানো তো প্রতিকার কোর। তারপরে গলায় দড়ি দিয়ে মোর তুমি। এককালে ভালবেসেছিলাম। এই আমার আশীর্বাদ।”

জানি না, কেন এমন হ’ল ! সেই মল্লী, যার জন্য সারা পৃথিবী ছাড়তে পারতাম, তার এই পরিণতি ? নিজের প্রবৃত্তি এতদিন দমন

ক'রে রেখেছিল, বিলাসের হাওয়ায় লম্পটের প্ররোচনায় নিজেকে বিসর্জন দিল! পার্থিব উন্নতির আশায়? বিপদে পড়েছে এখন, তাই ডাকছে আমাকে। ঘৃণায় আপাদ মস্তক শিউরে উঠল। কোন দিন জীবনে মল্লীকে ছুঁতে পারব না। হোড়ের ঘরণী হওয়াই অবশেষে ভাগ্যে লেখা ছিল ওর।

* * *

খবরের কাগজের হেড লাইনে আজ মল্লীর নাম! যশে নয় গৌরবে নয়। সম্মানে শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে কেউ পড়ছে না মল্লীর ইতিবৃত্ত। ভয়ে, বিতৃষ্ণায় বুক কেঁপে উঠছে সকলের। রোজ এমন মেয়ের সঙ্গে দেখা হ'ত, এমন মেয়ে কাছে বসে অন্তরঙ্গ আলাপ করত! ওর মনে এই ছিল?

খুনী! দেশপ্রেমিকার চোরাই পিস্তলের অগ্নিবর্ষণ নয়। জনগণের জয়ধ্বনি, ফুলের মালা, উচ্চশির। হত্যা হত্যা নয়—জয় সেখনে। কাগজে কাগজে ছবি, পায়ের ধূলো নেবার উদ্দেশে ছোটাছুটি। অবশেষে জাতীয় সঙ্গীত—"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান—!"

হাত-দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা! মল্লীর মত কোমলার হাতে অস্ত্র—বীভৎস বর্ণনা। রাত্রিবেলায় হোড়ের বাড়িতে তরুণী, নতুন নয়। বিরাট বাড়ি, ত্রিতলে গৃহিণী সুপ্তা। মল্লীর যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। বাগানের মধ্যে বসবার ঘরে হোড় দরজা বন্ধ ক'রে বসেছিলেন। ধারালো দা, সদ্য শান দেওয়া। কাপড়ের নীচে ছিল। অসতর্ক হোড়, মেদভারে স্থূল বপু। চেয়ার উল্টে প্রথমে তাঁকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রা তরুণী। হোড়ের মৃত্যু সহজেই হ'ল।

মল্লী কাঠগড়ায় একটিও কথা বলেনি। দোষ অস্বীকার করেনি।

সাক্ষ্য দেবার প্রহসন চলেছিল দার্ঘকাল ধরে। মল্লীর চেনা-জানা সকলেরই ডাক পড়েছিল। আমারও ডাক ছিল। সত্য কথাই বলেছি।

ধরা পড়ার সময়ে ও হাজতবাসের কালে মল্লীর প্রতি সুষ্ঠু আচরণ হয়নি। ফলে, অবাঞ্ছিত সন্তানের সম্ভাবনা লুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং, দয়ালু জজ সাহেবের ফাঁসির হুকুম দিতে বাধা ছিল না।

মল্লীর কাহিনী আমি জানি না, আমরা কেউ জানি না। অমন ভাঁটির নীচে খরস্রোত, পায়ের নীচে চোরাবালি ? কমনীয়তার মধ্যে অত বীভৎস হিংসা ? কেউ টের পায় নি। সে প্রতিশোধ নিয়েছে, বুঝেছিলাম। শুধু বুঝিনি তখনও মল্লীকে আমি কত ভালবাসি। পাপপুণ্য সে ভালবাসার কাছে মিথ্যা হয়ে যায়। শুধু হোড় কেন— শতসহস্র হোড়ের অবাঞ্ছিত প্রাকৃত সন্তান আমি সহ্য করতাম, যদি তাদের জননী হ'ত। কিন্তু, এ উপলব্ধি বড় দেরীতে এল। বড় দেরী হয়ে গেছে।

(পরিশিষ্ট)

মল্লীর কাহিনী কেউ জানে না--কিন্তু আমি তো জানি। মহানগরীতে নিত্য এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। মহাকালের খাতায় লেখা হচ্ছে একই মর্মছেড়া কাহিনী—শোষক ও শোষিতের ইতিহাস। জীবন যাকে স্বাচ্ছন্দ্য দেয়নি, দেয়নি মানুষের সহজ অধিকার অন্নবস্ত্রের সংস্থান, তাকেও গ্রাস করতে লুব্ধ বাহু প্রসারিত হয়ে আছে চারিদিকেই।

আমি তোমার দিকে নির্ণিমেষে চেয়ে আছি, হে মহানগরী ! হে মহানগরী, রাত্রির কিংখাব-যবনিকা দুলছে তোমার মুখের ওপরে।

কিন্তু, একটুও তো কোমল করতে পারেনি তোমাকে, হে নিষ্ঠুরা নাগরিকা! ইট-কংক্রীটে গাঁথা তোমার সৌধ, তার মধ্যে মানুষ আছে, মন নেই।

হে রাত্রির নগরী, তোমার বুকে কি আছে, বল। প্রেম নেই, করুণা নেই, মনুষ্যত্ব নেই। মানুষের ক্ষুধা তোমাকে ক্ষুধিত করেছে। কীটের মত রাত্রির অনাবৃত অন্ধকারে মুক্তি পেয়ে বিচরণ করছে মানুষের লোভ, মানুষের হিংসা, মানুষের লালসা।

কোন্ মানুষ? পুরুষের লালসা গৃহছাড়া করেছে নারীকে—যে দেউলের প্রদীপ হ'ত, সে হয়েছে রাস্তার গ্যাসবাতি। বহুকে সে পুড়িয়ে মারছে, কারণ তাকে মারণমন্ত্র শিখিয়েছে পুরুষ। হে মহানগরী তোমার পীচঢালা পথে আমারও তো পদক্ষেপ নিঃশঙ্ক নয়। সূর্য নিভে যায়, বিদ্যুৎবাতি জ্বলে ওঠে—ভয় পাই আমি। পুরুষের লোভ আর লালসা কতবার নারীকে কক্ষচ্যুত করেছে। অন্ধকারে শ্বাপদের সমান মানুষের অবচেতন প্রবৃত্তি বা'র হয়ে এসেছে। তার সঙ্গে বার হয়ে এসেছে শিকারী শিকারের আশায়।

হে রাত্রি, হে মহানগরীর রাত্রি, আমিও তোমাকে ভয় করি। ভয় পাই মল্লী দত্তের কাহিনী স্মরণে। নারী যখনই বাইরের জগতে পা বাড়ায় তখনই তাকে পুরুষের শরণাপন্ন হ'তে হয়। নারী যখনই বাহিরে প্রতিষ্ঠা চায়, তখনই তাকে পুরুষের দৃঢ় করমুষ্ঠির মধ্যে ধরা দিতে হয়। যে প্রেমিক, সে দেয় স্বর্গ; যে লোভী, সে আনে ধ্বংস।

হোড় মল্লী দত্তের সঙ্গে আলাপ করেছিল। মানুষখেকো কুমীরের মত থ্যাবড়া মুখে ছোট ছোট কুমীর-চোখ জ্বলে উঠেছিল। লোভে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে চেটে কথা বলেছিল হোড়—"বেশ বেশ, মিস্ দত্ত। কাজ আপনাকে দেব না তো কাকে দেব? আপনার মত মেয়েই

তো চাই আমরা। তবে, একটু আলাপ ক'রে নেওয়া দরকার। কেমন ধরণের কাজ আপনাকে মানাবে, জানতে চাই।"

অনভিজ্ঞা মল্লী, মাথার ওপর অভিভাবক নেই। বন্ধুর মামা ও বিশিষ্ট ব্যক্তি হোড়মশাই। সংসার চলে না বাবার পেনসনের টাকায়, মল্লী একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। চাকুরী চাই মল্লীর। রাত জেগে সেলাই ক'রে শিক্ষয়িত্রী নীহারিকা বা প্রতিবেশিনী ডলির সাহায্যে বিক্রী ক'রে সংসার চালানো যায় না। আশায় আশায় মল্লী মিশতে লাগল হোড়ের সঙ্গে।

হোড় একদিন-দু'দিন বাড়ি নিয়ে গেল। ভাগ্নীর বন্ধু মেয়ের বয়সী। দুষ্য কিছু ছিল না। বরঞ্চ মল্লীর বৃদ্ধা মাতা সাগ্রহে উপদেশ দিলেন, "ধরে পড়ে থাক, মল্লী। হোড়মশাই মস্ত লোক। মন যুগিয়ে চললে তোর হিল্লে হয়ে যাবে।"

মল্লী উপদেশ গ্রহণ করেছিল। হোড়ের ব্যবহারে যদি কোন বৈলক্ষণ দেখে আত্মরক্ষার সহজাত তাগিদে তার সন্দেহ আসত, তখনই সে নিজেকে বোঝাত, "উনি বড়লোক, সাহেবী ধাঁচের। ওঁর ব্যবহার কি আমাদের মত হ'বে? আমার পাপের মন, তাই চোখে লাগে।"

একদিন নিষিদ্ধ প্রেমের ছবি দেখাতে আমন্ত্রণ করলেন হোড়-মশাই। কথা ছিল ভাগ্নীও যাবে। যথাকালে দেখা গেল শুধু হোড়। আমতা আমতা ক'রে বললেন, "রমা আসতে পারল না। তা' আমার সঙ্গে একা যেতে আপত্তি থাকা উচিত নয় আপনার। ক'দিন পরেই তো দশজনের মধ্যে বসে কাজ করতে হ'বে।"

মন নেচে উঠল মল্লীর। পুরনো বাক্স হাতিয়ে বার হয়েছে মায়ের জরাজীর্ণ গরদ। তাই পরেছে ও, ছিটের লাল জামার নীচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে সুগোল শ্যাম বাহু কচি কলাগাছের মত। চোখের নীচে

সুরমা টানা, খোঁপায় বাড়ির গাছের গন্ধরাজ। সিনেমা দেখা মল্লীর জগতে অভাবনীয় ব্যাপার কি না।

মা কটাক্ষে হোড়ের প্রকাণ্ড ফোর্ড-চাম্পিয়ন গাড়ীখানা দেখে নিলেন—দামী সাহেবী পোশাক, হীরের আংটি, সোনার সিগারেট কেসও চোখে পড়ল। অতি ভদ্রলোক সন্দেহ নেই। মল্লীর পিতৃতুল্য। সুতরাং—"যা-না, মল্লী, লজ্জা কি ? রমার মামা তো তোরও মামা।"

নির্বিঘ্নে বাড়ি গেল সে সন্ধ্যা। ত্ব'একবার হোড়ের গরম নিশ্বাস ঘাড়ে লেগেছিল মল্লীর। কিছু মনে করেনি সে। আর একবার হোড়ের শিথিল-পেশী, পিচ্ছিল হাত মল্লীর হাতের ওপর এসে পড়েছিল। কাঁপা-গরম হাতখানা। মল্লী চমকে তাকাতেই হোড় হাতখানা সরিয়ে নিয়ে বিনীত স্বরে বললেন, "সরি। চেয়ারগুলো কি বিশ্রী ঘেঁষাঘেঁষি, দেখছেন ?"

আর একদিন যাওয়া হ'ল বোটানিক্যাল গার্ডেন-এ। সেদিন রমা ছিল সঙ্গে। ভাগ্নীর বন্ধুকে ভাগ্নীর মতই সহজে হোড় গ্রহণ করেছিলেন সেদিন। হাসিগল্পে দিন কেটে গিয়েছিল। কথা হ'ল সেদিন হোড় ত্বই বন্ধুকে শীঘ্রই নৈশ ভোজনে হোটেলে নিমন্ত্রণ করবেন।

তারপর একদিন মল্লীকে অফিসে ডেকে নিয়ে হোড় নামধাম লিখে রাখলেন—গুণপণাসহ। মল্লী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

অবশেষে নৈশভোজনের দিন। এক টুক্‌রো কাগজ গাড়ীর চালকের হাতে—"মিস্ দত্ত, গাড়ী পাঠালাম। চলে আসবেন। বিশেষ কাজ থাকায় নিজে যেতে পারলাম না।"

মল্লী ভেবে নিল মামাজী ভাগ্নীকে বোধ হয় আনিয়ে নিয়েছেন। গাড়ী সোজা মল্লীকে হোটেলে পৌঁছে দিল। শীতের সন্ধ্যা সাতটা। রমা ছিল না সেখানে।

ছোটগোছের হোটেল সাহেব পাড়ায়। আলাদা ঘরে ব্যবস্থা করা আছে দু'জনের খাবার। কোথায় রমা ?

"রমার পেটের অসুখ। উঠতে পারছে না। আজকের মত দু'জনেই খাওয়া মেটানো যাক, কি বলেন, মিস্ দত্ত ? ও ভাল হ'লে আবার ব্যবস্থা করা যাবে।"

দ্বিধায় মল্লী বলেছিল, "আজকে বাদ দিলেই হ'ত ?"

কুমীর মুখের হা-হা হাসিতে হোটেলের দেওয়াল কেঁপে উঠল,—"তা কি হয় ? আগেই অর্ডার দেওয়া আছে। তাছাড়া, আমাকে ভয় কি, মিস্ দত্ত ? ক'দিন বাদে আমার সঙ্গে কাজ করতে হ'বে না ? Come on, don't be a prude."

রাত্রি নেমে এল নীরবে পার্ক ষ্ট্রীটের বুকে, চৌরঙ্গীর কোণে। ঢেকে দিল মানুষের পাপ।

লেমনেডে মেশানো হয়েছিল সুরা। পুরাতন পাপী হোড়ের সঙ্গে অখ্যাতনামা, নিন্দাজনক হোটেলটির ম্যানেজারের মিত্রতা ছিল। বহু পাপ একত্রে করেছে তারা। অনভিজ্ঞা কিশোরীর অনাস্বাদিত সুরার নেশায় জ্ঞান হারানো স্বাভাবিক। নিশীথের অন্ধকারে সংঘটিত হ'ল যা বহুদিন হয়ে এসেছে, যা বহুদিন হ'বে।

সভ্যতার বড়াই করি আমরা। পশুত্বকে পৌরুষ বলে ভ্রম করি। অপ্রকৃতিস্থ হোড় একবার ভেবেও দেখেনি। অনিবার্য ফল ঘটেছিল। বীরেনের শেষ কথাগুলো সমিধে অগ্নিসংযোগ করল। একজন শোষিত অন্ততঃ শোষকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করল। ছয়-মাসে তিলে-তিলে জাত গ্লানি, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। একজন বাংলার মেয়ে অন্ততঃ শিখিয়ে দিল।

সে শিখিয়ে দিয়ে গেল—অত্যাচারের দিন শেষ হয়েছে। আমি

প্রতীক মাত্র। কিন্তু, আমার পেছনে আছে নিরুদ্ধ শক্তির সমর্থন। হে মহানগরী, তোমার পাপের দিন শেষ হয়ে গেছে। যদি আমাকে চাও—আমার একমাত্র মূল্য তোমাকে দিতেই হ'বে। মানুষের আত্মবিক্রয়ের একমাত্র মূল্য—প্রেম।

মালতী

মালতী নামটা আমার ভাল লাগে। মেয়েটিকেও ভাল লাগে। তার প্রকৃতি একটু বিচিত্র। সে সহজ। কিন্তু, অত সহজ বলেই

সংসারে মন নেই মালতীর। যদি প্রশ্ন করা যায়, "তাহ'লে সংসার করলে কেন ?" চুপ ক'রে থাকে ও। জবাব দেয় না।

কলকাতার বাইরে ওর বাবার একটি বাগান বাড়ি আছে। সেখানে গেলাম কোন ছুটীতে বেড়াতে।

মালী হাট বাজার ক'রে আনে। সঙ্গের পুরনো চাকর সংসার চালায়। দায়িত্বহীন অবকাশে ঘুরে বেড়াই ক্রমাগত এখানে ওখানে।

গেলাম স্থানীয় স্কুলের বোর্ডিং-এ। মেয়েদের সরকারী স্কুল। ছাত্রীবাস সংলগ্ন। ছাত্রী বিশেষ কেউ নেই এখন। ছুটীতে বাড়ি গেছে। কয়েকটি শিক্ষয়িত্রী মাত্র আছেন। ওঁদের সঙ্গে মালতীর বহুদিন যাবৎ সখ্যতা। মালতী দেখা করতে যায়। প্রায়ই যায়। এখানে সামাজিক পরিমণ্ডল বলতে শূন্য। শূন্যকে পূর্ণ করতে যা পাওয়া যায়, তা-ই যথেষ্ট।

গল্প ক'রে মালতীর সময় কাটে। আমি ওখান থেকে অন্যত্র

যাই। বনে জঙ্গলে ফিরি। বনের বন্যতায় মুগ্ধ হই। আবার ওখানে যাই, মালতী আর আমি বাড়ি ফিরি।

নিরালা অবসর—ভরে তোলা যায়। এমন কিছু নেই, দু'জন ভিন্ন কেউ থাকে না বাড়িতে। মালী বাগানের মধ্যে নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। পুরনো চাকর ঘরে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। গুরুজন-লঘুজন কেউ নেই। শুধু মালতী, আর আমি।

আমি আর মালতী। আমি মালতীর স্বামী। ইচ্ছা করে, তাকে একটু কাছে পাই দিনের বেলাও। রাত্রির অপেক্ষায় প্রহর গনা সহ্য হয় না। একান্নবর্তী পরিবারে মালতীকে দিনে পাওয়া দুর্লভ। সেই দুর্লভ সময় যদি হাতেই এসেছে, মালতী আমার প্রসারিত হাতের মধ্যে আসে না।

কৌশলে নিজেকে সরিয়ে নেয়। মধ্যে পাশ বালিশ টেনে রাখে। নরম, শিথিল ব্যবধান। কিন্তু, তারই পেছনে জেগে থাকে মালতীর রহস্যময় সত্তা। কাজেই, অকথিত নিষেধ আমার অতিক্রমের সাধ্য নেই। দুই বছরের মধ্যে মালতীর কুল পাই নি।

মালতী আরম্ভ করে গল্প। রাজ্যের যত বাজে লোকের গল্প। সে গল্প আমার বা মালতীর গল্প নয়।

প্রায়ই মালতী শিক্ষয়িত্রীদের গল্প করে। কলকাতায় বোমার পতন আশঙ্কায় মালতীর বাবা এখানে বাড়ি করেছিলেন। দীর্ঘ দিন তারা এখানে ছিল। তখন থেকেই শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে আলাপ।

বিয়ের আগে নাকি বাবা প্রায়শঃ আসতেন এখানে। মা বাবার সঙ্গে সঙ্গে অনুঢ়া কন্যা মালতী থাকত। তখনও তো স্বামী সংযোগ হয়নি ওর। শিক্ষয়িত্রীরা একমাত্র শিক্ষিত পরিবেশ রচনা ক'রে ছিলেন এই মফঃস্বল শহরে। চেঞ্জারদের সঙ্গে বন্ধুত্বে সুখ নেই।

তারা পরিবর্তনশীল, এঁরা নিত্য। তাই এঁরা মালতীর বন্ধু ছিলেন।

মালতী আকাশ পাতাল ভাসিয়ে কথার স্রোত চালায়। নবীন, পশার বিহীন উকিল আমি, শুনে শিখে নেওয়া উচিত। কিন্তু, মালতীর সিক্ত কালো চুল বাতাসে ঢেউ তোলে। অধর তাম্বুল রাগে আরও মসৃন হয়ে ওঠে। আমি কি শুনছি, সর্বদা মনে রাখতে পারি না। মালতী আমাকে ভুলিয়ে দেয়।

জিজ্ঞাসা করি, "সংসার ভাল লাগেনা মানে, নিশ্চয় আমাকে ভাল লাগে না?"

মালতীর চোখে হাসির ধার হীরার মত চক্ চক্ ক'রে ওঠে, "পাগল! বিয়ের সঙ্গে এ ভাবের যোগ নেই।"

"মালতী, এত দূরে বসে কথা বলছ কেন? দেখ, এ বাড়িতে তুমি আমি ছাড়া কেউ নেই। মালতী, এ আমাদের মধুচন্দ্র। এই প্রথম হ'ল।"

মালতী উত্তর দিল, "উকিল না হ'য়ে তুমি কবিতা লিখলেই পারতে। আর, কাছে বেশী না আসাই উচিত। ডাক্তারী মতে স্বাস্থ্যকামীর সংযত হওয়া উচিত।"

মালতীর নাবালিকা অবস্থায় বিবাহ হয়নি। বিবাহে রীতিমত মত ছিল ওর। অথচ সংসারে মন নেই, স্বামীর সোহাগ সে চায় না। তবে, মালতী বিয়ে করল কেন?

শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গ তার কাম্য। আমি দেখেছি ওঁদের। প্রায় সকলেই চিরকুমারী ও বয়স্কা। মালতীকে ওঁরা বিশেষ যত্ন করেন। গাছের আমের জেলী ক'রে দেন। খাবার ক'রে রাখেন। মালতী ওঁদের কাছে ছোট্ট, তাই আদরের। নিরুপদ্রব মসৃণ দিন যাত্রা ওঁদের। মাঝে মাঝে মনে হয়, এই জীবন—বোধ হয় মালতীরও কাম্য ছিল।

একদিনের কথা বলি। বিভাদির ঘরের চিত্র। গরমের দিন। পরিষ্কার মেজে, ধোয়া মোছা। চারিদিক বন্ধ। চৌকীর বিছানা ঢেকে শীতল পাটি মেলা। সারা ঘরে ফুলের গন্ধ। রাশি রাশি বেল ফুল স্কুলের বাগানে।

অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি। ফিরে এলাম মালতীকে নিয়ে যেতে। স্কুলবাড়ি বন্ধ। ছাত্রীরা নেই। দরোয়ান সোজা ঘরে নিয়ে গেল।

ঘরে শুচিতা আর পারিপাট্য। কোথাও বিশৃঙ্খলা নেই। একরঙা ওয়াটার কালার ছবি। চোখে লাগে না। নামানো একতারার সুর যেন সারা ঘরখানি। মালতী চৌকির ওপরে বসে রুমালে বেলফুল তুলে নিচ্ছে, উপহার।

আমি প্রবেশ করলাম। বেমানান, বেখাপ্পা আমি। লম্বা চওড়া একটি পুরুষ। রোদে লাল ঘর্মাক্ত কলেবর। মূর্তিমান বন্যতা যেন। সারা ঘরের শান্তি যেন ব্যাহত হয়েছে আমার উপস্থিতিতে। লিখিত নিষেধ যেন হাহাকার ক'রে উঠছে, 'না, না !'

ঘরে যাঁরা বসেছিলেন, সকলেই একটু ত্রস্ত হয়ে উঠলেন! শকুন্তলার আশ্রমে অনাহূত দুষ্মন্ত যেন আমি।

বিভাদি একখানা বেতের বাস্কেট্‌-চেয়ার দেখালেন, "একটু বসুন। চা হচ্ছে। মালতী চা-টা খেয়েই উঠবে।"

আমি বোকার মত বলে উঠলাম, "এই গরমে চা?" বিভাদি একটু শক্ত গলায় বললেন, "রোদের মধ্যে চা খেলে জলতেষ্টা লাগে না, গরম কম বোধ হয়। মালতীর দুপুরবেলায় চা খাওয়া অভ্যাস চিরদিনের।"

আমাকে কান ধরে কে যেন বসিয়ে দিল। মালতীর কি যে

অভ্যাস, বা অনভ্যাস, আমি স্বামী হয়ে যে দুই বছরেও জানি না, এ কথা আমাকে এঁরা বেশ বুঝিয়ে দিলেন।

বেতের বাস্কেট্-চেয়ারে অপ্রতিভ হ'য়ে বসতে যে'য়ে আরও অপ্রতিভ হলাম। চেয়ার মহিলাজনোচিত। চেয়ার আমাকে ধরলো না। একখানা কাঠের চেয়ার রেখাদি এগিয়ে দিলেন। টেবিলে স্তূপীকৃত খাতা, পেন্সিল, কলম। চমৎকার গুছানো।

কণিকাদি এক কাপ চা আমার সামনে রাখলেন। মালতী দুপুরের রোদে চা খেতে ভালবাসে, সেই মালতীর স্বামী আমি। চা না খেলে হয়তো অপরাধ বিবেচনায় মুখ পুড়িয়ে গরম চা খেলাম।

মালতী যেন একটু অপ্রতিভ, একটু অপরাধী। আমি ওখানে উপস্থিত থেকে যেন ওর লজ্জার কারণ হচ্ছি।

বাড়ি ফিরে ভেবে দেখলাম। আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। আমার জন্য মালতীর লজ্জা কি? আমার চেহারা ভাল, আমি সুসজ্জিত থাকি। ওখানে দুটো—তিনটের বেশি কথা আমি বলি না। তবে?

ওই ঘরে সত্যই আমি অবান্তর। স্বয়ং-সম্পূর্ণ মহিলার ঘর একখানা। চড়া রং, কড়া সুর ওখানে নেই। শালীন নম্র পরিবেশ।

ওই পরিবেশ নিশ্চয় মালতীর ঈপ্সিত ছিল। মালতী ওখানে যায় অন্য সমাজের অভাবে নয়, ওর ভাল লাগে বলে। নইলে অত যাবে কেন? চিরকুমারী হয়ে থাকার ইচ্ছা ছিল বিয়ের আগে। প্রায়, এখানে আসতো। এঁদের আওতায় 'তৎ-ভাবে ভাবিত' হয়েছিল অবশ্য। তবে বিবাহে রাজী হ'ল কেন? বাবার আদরের মেয়ে ও মায়ের নয়নমণি। অনিচ্ছায় অল্প বয়সে জোর ক'রে ওরা বিবাহ দিতেন না। বিয়েতে ওর মন ছিল বলেই শুনেছিলাম।

যদি কবি বা গায়ক হতাম, নিশ্চয় উদাসিনীর মন আমি জয় ক'রে নিতে পারতাম। কিন্তু, তা না হ'য়ে আমি নেহাৎ গদ্য উকীল মাত্র। মালতীর রহস্য আমি উন্মোচনে অক্ষম।

তবু, চেষ্টা আমাকে করতেই হবে। জ্যোৎস্না রাত্রে নিবিড় হয়ে মালতীর অতি কাছে এলাম। দিনের মালতী, রাতের মালতী পৃথক। মধ্যে আর বাধা নেই—মালতী আমার বাহুবন্ধনে আত্মসমর্পিতা।

প্রশ্ন করলাম, "একটা সত্যি কথা বলবে, মালতী ? তুমি চিরকুমারী থাকতে চেয়েছিলে না, তোমার বিভাদিদের মত ?"

"তাহ'লে বিয়েতে রাজী হলাম কেন ?" মালতীর স্বর আবেগে জড়িত। বুঝলাম, যথার্থ সময় এসেছে। সন্নিহিতার আরও নিকটস্থ হ'তে হ'তে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "বিয়ে ক'রে পরিবর্তন নেই তোমার ? ভেতরে সংসারী হবার ইচ্ছা ছিল না তোমার ?"

মালতীর নিশ্বাস আমার নিশ্বাসে মিলেছে—চরম সত্য হয়তো আজই পাওয়া যাবে। পুরুষের নিবিড় আলিঙ্গনে দ্রবীভূত নারী-সত্ত্বা। আর সে সুদূর নয়। মালতী উত্তর দিল, "তা বলতে পারো। বেশ নির্ঝঞ্ঝাট জীবন।"

"এর চেয়ে ভাল লাগত ?"

"কি ক'রে বলবো ?"

"মালতী, অন্যরকম কাউকে বিয়ের ইচ্ছে ছিল তোমার ?"

"না, তখন আমার হ'লেই হল গোছের হয়েছিল।"

সমস্ত শরীর আমার হিম হয়ে গেল। বুকের ওপর মালতী যেন পাথর হয়ে গেছে ক্রুদ্ধ কোন ঋষির অভিসম্পাতে। অতিকষ্টে বললাম, "সে সময়ে তোমার কি হয়েছিল ?"

"আমার দারুণ ভয় হয়েছিল।"

"তার মানে ?"

আমার শিথিল হাত আবার নিজের গলায় তুলে নিয়ে মালতী এবার বিরক্ত হয়ে অনেক কথা বলল নিজের স্বল্পভাষী স্বভাবকে অতিক্রম ক'রে, "তোমার দোষ, তুমি একটু বোকা। এটাই আমার পছন্দ হয় না। নইলে তোমার অন্য কিছুতে আমার আপত্তি নেই। বিভাদিদের ওখানে যাওয়া আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। ওঁরাও আমাকে ভালবাসেন। চিরকুমারী থাকার ইচ্ছা সত্যই আমার ছিল। কিন্তু ওঁদের সঙ্গে মেশার পরে মত বদলালাম।"

"ওরা তো বেশ ভাল আছেন, বলছিলে না ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়। দেখলে না আজ? তুমি যেন ওখানে একটা উপদ্রব। আমার লজ্জা হচ্ছিল।"

"কিন্তু মালতী, আসল কথাটা চাপা দিও না। তোমার ভয় হয়েছিল কেন? তুমি চিরকুমারী থাকতে চেয়েছিলে, ওঁদের জীবন তোমার ভালই লাগতো। তবে ওঁদের সঙ্গে মেশার পরে মত বদলালে কেন? ওঁরা বুঝি তোমাকে বিয়ে করতে বলতেন ?"

বিদ্যুতের মত হাসির আভা মালতীর মুখে ফুটে উঠল। চোখেও সেই অশণি—দীপ্তি।

"না ওঁরা ভাল ছিলেন সত্যি। কিন্তু, ওঁরা যে কত ভাল আছেন এই কথা বারবার আমাকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করায় আমার ভয় হ'ল। আমি চট্ ক'রে বিয়ে ক'রে ফেললাম।"

"ভয় কেন ?"

"না, তুমি সত্যিই বোকা।" মালতীর অধর আমার অধরের অতি কাছে—

"আমার ভয় হল, আমিও অমনি ক'রে ভবিষ্যতে কুমারী তরুণীদের বোঝাতে চেষ্টা করবো, আমি কত ভাল আছি। বুঝেছ এখন, বোকা?"

গ্রেগরী পেক্

সাহিত্যিক ব্যাপারে মাঝে মাঝে এখানে ওখানে চলাফেরা ক'রে থাকি। পথে-ঘাটে কত লোক দেখি আসা-যাওয়ার পারাপারে। কতজনকে নিয়ে কাহিনী রচনা করি, কতজনকে কেবল মনে স্থান দিয়েই ক্ষান্ত হ'তে হয়। কাগজে স্থান দিতে তো পারি না। কারণ, গতিশীল মনের ধর্ম গতি, জীবনও গতির দাস। সেই গতির আবর্তে জেগে ওঠা মুখগুলো আবার তলিয়ে যায়। মানুষকে আজ আমি নিঃসন্দেহে ভালবাসি। কিন্তু মানুষকে তো স্মৃতির সাহায্যে শিল্পের মধ্যে অমর ক'রে রাখতে পারি না। জীবনে সময় যে বড়ই কম।

এবারের ভ্রমণে দেখলাম তুইজনকে। কয়েক মাস আগের ঘটনা। তখন রেল কোম্পানী প্রথম শ্রেণী উঠিয়ে দিয়ে চেনা-জানার শ্রীক্ষেত্র খুলে ফেলেছে। কোটিপতিকেও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠতে হয়, ব্রিফ্‌লেস্‌ ব্যারিষ্টারকেও। সুতরাং, আমরা সকলে সমন্বয়ের শ্রীক্ষেত্রে মিলিত হ'লাম।

দেখলাম কয়েকটি যাত্রীর মধ্যে বিশেষ ক'রে এক দম্পতীকে। ভদ্রলোক সুপুরুষ ও সুসজ্জিত। সঙ্গের মহিলা ঠিক জোড়া মেলাবার জোড়া নয়।

শুনলাম ওঁরা বেশিদিন পূর্বের জোড়া নয়। কয়েক মাস মাত্র

বিবাহ হয়েছে। ভদ্রলোক বড় অফিসার। প্রথম স্ত্রী সহবাসে যাচ্ছেন শ্বশুরালয়ে।

স্ত্রী ও স্বামী, স্বামী ও স্ত্রী। নব-বিবাহিত হ'লে তাঁদের নিঃসন্দেহে ধরা যায়। পত্নীর সিঁথির সিন্দূর উজ্জ্বল, চুড়ি-বালার রং-এ কর্ষিত স্বর্ণদীপ্তি অম্লান। শাড়ীর স্তরবিন্যাসে নিপুণতা, জামার স্কন্ধদেশ চুলের তেলে মলিন নয়।

পতির আংটি, বোতাম, ঘড়ি নতুন। কোঁচার ভাঁজ, অটুট ইস্ত্রি পিরান যত্নের সাক্ষী। জুতোয় পালিশ, চুলে ব্রাশ।

অবশ্য ইহা বাহ্য। উভয়ের মুখচোখের দীপ্তিও অনুরূপ। দৃষ্টি-বিনিময়ের মধ্যে আশা। পরস্পরের কাছ থেকে যেন অনেক প্রাপ্তি আছে।

পরের অধ্যায়ে অবশ্যই অন্য পরিণতি। পোশাক পরিচ্ছদের অধোগতি লক্ষ্যনীয়। মিইয়ে যাওয়া মুড়ির মতই বাহ্য আকৃতি। মুখেচোখে দীপ্তি নেই। পরস্পরের কাছ থেকে যা পাবার সে তো পাওয়া হয়েই গেছে। আশানুরূপ নয় যে, বোঝাই যায়। সহ্য করতে হ'বে বলেই যেন সহনশীলতার ছাপ মুখে-চোখে। পরস্পরের সঙ্গে আনন্দ নেই। তখনও দম্পতী বলে বোঝা যায়।

আমাদের স্বামী-স্ত্রী প্রথম পর্যায়ের জীব। স্বামী এখনও স্ত্রীর প্রতি ভদ্র ব্যবহার দেখাচ্ছেন। সুখ-সুবিধায় দৃষ্টি রেখেছেন। স্ত্রী এখনও বেশভূষা, হাবভাব দ্বারা স্বামীর মনোরঞ্জন করতে উৎসুক।

কিন্তু, কিন্তু? স্বামী অতি সুপুরুষ, অতি শৌখিন, অতি পালিশ-বিশিষ্ট ভদ্রব্যক্তি। স্ত্রী—একেবারে অন্য রকম। ভদ্রমহিলা সম্পর্কে বেশি বলা অধর্ম হ'বে। পাঠকবৃন্দ মাপ করবেন।

পরিচয় জানলাম ভদ্রমহিলার পিতা অর্থশালী। অতএব স্বামী-ভাগ্য বন্দিত তাঁর। কিন্তু, এই ধরণের বিবাহ কি স্থায়ী? বিদেশী বাক্য

বলে : বিবাহটি পাথরে ঘা খাচ্ছে, 'The marriage is on the rocks.'

ভদ্রলোক কর্তব্য পালন করছেন, যদি বা না-ও করতে চান, মহিলা তাঁর কান ধরে করিয়ে নিচ্ছেন।

"এখানে রোদ লাগছে। সার্শি নামিয়ে পাল্লা তুলে দাও।"

"আমার জলতেষ্টা পেয়েছে।"

"গাড়ী এতক্ষণ থেমে আছে কেন?" ইত্যাদি ইত্যাদি কথার স্রোত। ভদ্রলোক কয়েকখানা ইংরাজি পত্রিকা হাতে নিয়েছিলেন। পড়ার অবকাশ কিন্তু পেলেন না।

ভদ্রলোকের চলা-ফেরা সমস্ত কিছুতেই যেন বিশেষত্ব পাচ্ছিলাম। সে বিশেষত্ব পরিচিতির সন্ধান রাখে। একটু উর্ধে সীমিত ভ্রূরেখা; চিবুকের পুরুষালি টোল, হাসি, গঠন যেন আমার বহু চেনা।

একাগ্র মনে ভাবতে চেষ্টা করলাম : এঁকে দেখেছি কোথায়? এই যে হাল্কা বাফ্ রং-এর স্যুট-পরা ভদ্রলোক সিগারেটের ছাই ঝাড়ছেন : কখনও বা বসছেন, জানলায় মুখ বাড়াচ্ছেন। এই যে হোল্ডঅল্‌টা সরিয়ে রাখলেন, ল্যাভেটরির দরজা বন্ধ করলেন, ইনি আমার এত চেনা কেন? কোথায় দেখেছি এঁকে?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল। ইংরাজি ছবির অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক—গ্রেগরী পেক্। সে তো অনেকটা এমনই দেখতে।

গ্রেগরী পেক্। নামে তার মহিলারা সজাগ হয়ে ওঠেন। পুরুষ সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকান। আধুনিক চিত্রের জনপ্রিয় নটের প্রতিচ্ছবি দেখলাম এখানে।

গ্রেগরী পেক্, জগতের ইতিহাসে চিরন্তন গ্ল্যামারের জয়। এই গ্রেগরী পেক্‌কে আবদ্ধচিত্ত রাখবার উপযুক্ত পাত্রী কি এই মহিলা?

ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে কথাবার্তায় মন দিলেন। হাতে তাঁর

একখানি ইংরাজি বার্তাবহ ছিল। সেই কাগজের সংবাদকে ভিত্তি ক'রে তিনি আলাপ চালালেন। অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের কয়েকজনের সঙ্গে তিনি মগ্নচিত্ত হয়ে গেলেন।

মহিলা প্রথমে চুপ ক'রে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপরেই তাঁর ভাব-বৈলক্ষণ দেখা দিল। তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। ছট্‌ফট্‌ করতে করতে তিনি ভদ্রলোকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইলেন নানা কথার সূত্র তুলে। রাজনীতি ও সমাজনীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জমান ব্যক্তি তখন সহজ স্বাভাবিক কথাবার্তায় ডুবে গেছেন। ভদ্রমহিলার সঙ্গে ছেলেমি ভিন্ন করণীয় কিছু নেই তাঁর। ভদ্রমহিলা আগাগোড়া তের বছরের খুকীর মত আবদারপানা করছেন। পূর্ণযৌবনা নারীজনোচিত আচার-আচরণ তাঁর ব্যবহারে লক্ষিত হয় না।

ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত। স্ত্রী আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বেঞ্চ থেকে উঠে সামনে এসে দাঁড়ালেন উনি। পাশে বসার চেয়ে সামনে দাঁড়ানো মনোযোগের বেশীভাগ আকর্ষণ করে।

আদুরে ভঙ্গিতে তিনি স্বামীকে কি যেন জানালেন, হাতমুখ নাড়লেন ভঙ্গিসহ। ভদ্রলোক প্রথমে অনাসক্ত ভাবে শুনলেন। তারপরে উচ্চ হাসি হেসে উঠলেন। আমার কৌতূহল লক্ষ্য ক'রে উনি বললেন, "শুনুন, ও কি বলছে। বলছে, গাড়ীখানা এধারে যাচ্ছে না উল্টোদিকে চলেছে। বুঝুন বুদ্ধি!"

আমার কাছ থেকে যা আশা করা হয়েছিল, আমি পূর্ণ করলাম। যদিচ মহিলা প্রাপ্তবয়স্কা, আমি স্নেহব্যঞ্জক হাসি টেনে আনলাম। মধুর স্বরে বললাম, "উনি বড় ছেলেমানুষ।"

মহিলা প্রসন্ন হলেন, ভদ্রলোকও সম্মতিসূচক ভাবে মাথা হেলালেন, তারপরে আমার ঈষৎ লজ্জিত দৃষ্টির সম্মুখে অভিনয় চললো। ছেলেমি

ও ন্যাকামির দ্বারা পুরুষের মন আকর্ষণ ক'রে ধরে রাখার চেষ্টা। এই অভিনয় নিজের দিকে অন্যমনস্কের মন ফেরাবার অস্ত্র মাত্র।

আমি ওদের দিকে একটু পেছন ফিরে বসলাম, যাতে দাম্পত্য-লীলার এমন খণ্ডাংশ, এমন ভগ্নাংশ আমার 'নীরস' নয়নের অন্তরালে সম্পাদিত হয়। পড়া কাগজখানাই আবার তুলে মুখ ঢাকলাম। ওঁরা আমি কাগজ পড়ছি ভেবে নিশ্চিন্ত হবেন।

কিন্তু পড়া কাগজ আর কত পড়া যায়? সুতরাং দৃষ্টি ফিরে এল ওই জোড়ার প্রতি। জোড়া মেলাবার জোড়া নয়। কতদিন গ্রেগরী পেক্ সন্তুষ্ট থাকবে?

ছেলেমির অবকাশে যে চাই মনের আদান-প্রদান। প্রথম বিবাহের পরের সে সহিষ্ণুতা স্থায়ী হয় না। অতৃপ্ত মন খোঁজে গুণবাহুল্য। রূপহীনার মূলধন যদি ন্যাকামি ও ছেলেমি ছাড়া শূন্য, তবে কি ক'রে গ্রেগরী পেক্‌কে ধরে রাখা যায়?

কি বোকা এই মহিলা! আজ অমনোযোগের ঈষৎ লক্ষণ দেখেই স্ত্রী ক্ষেপে উঠছেন, ভবিষ্যতে যখন ছেলেমির অভিনয় পুরাতন হয়ে যাবে, তখন কি করবেন উনি?

আমার কানে মহিলার স্বরলহরি ভেসে এল:

"আমার চোখটা জ্বালা করছে কেন?"

ভদ্রলোকের সাড়া না পেয়ে: "এই শুনছো, কেন চোখটা জ্বালা করে?"

মৃদুকণ্ঠে ভদ্রলোক যেন কি বললেন। ভদ্রমহিলার উচ্চকণ্ঠের কলঝঙ্কারই আমার কানে আবার এল:

"কয়লা পড়েছে? তাই নাকি? আচ্ছা কোন্ মুখে বসলে কয়লা পড়বে না, তুমি বলে দাও না। আমি সেই দিকে মুখ রেখে বসি।"

অসহিষ্ণু হ'য়ে আমি নড়ে-চড়ে কাগজ ফেলে বসলাম। ভদ্রমহিলার দৃষ্টি আমার সঙ্গে মিলিত হ'ল। অতি-সাধারণ, অতি-ন্যাকা, গুণহীনা, রূপহীনা মেয়েটির চোখ আমাকে জীবনের একটি প্রধান ও প্রথম শিক্ষা দিয়ে গেল অনায়াসে, সহজে।

চোখ আমাকে বললো: তুমি নিদারুণ মুর্খ। বই-পড়া ও বই-লেখা ছাড়া জাগতিক ব্যাপারে তোমার নির্বুদ্ধিতা দেখে অতি কষ্টে হাসি চেপে রেখেছি। তুমি আমাকে বোকা মনে করেছ, আমি বুঝেছি। কিন্তু বোকা তুমি।

চোখ আমাকে বললো: গ্রেগরী পেক্‌কে কি দিয়ে বাঁধবে? রূপ বা গুণ, কোনটাই এক নারীর পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সম্ভব নয়। রূপসীর অপেক্ষা অধিকতরা রূপসী সে দেখবে। গুণবতীর চেয়েও গুণবতী তার কাছে আসবে। অতএব?

চোখ আমাকে বললো: তাই তাকে আঁকড়ে ধরে রাখছি শিশুর ব্যাকুলতা দিয়ে। দুইটি বাহুর মাদকতা পুরুষ ভুলে যেতে পারে, কিন্তু দুইটি বাহুর ব্যগ্র-নির্ভরশীল অন্বেষণ কোন পুরুষ এড়িয়ে যেতে পারে না। গ্রেগরী পেক্‌কে বেঁধে রাখবার একমাত্র উপায় এই। জেনে রাখো তুমি।

ধাক্কা

তরমুজের টুকরো গলাধঃকরণ করছে একটি ছেলে—বয়স তার বেশি নয়। সতেরো বছর মাত্র, কিন্তু প্রকাণ্ড একটা দৈত্যের মত আকৃতি। ছেঁড়া হাফসার্ট পরা, সস্তা পাজামা। ধুতি কেনবার পয়সা নেই, তাই বেমানান দেহ অবাঙ্গালী সুলভ পরিচ্ছদে আবৃত ক'রে রাখতে হয়।

ছেলেটা জায়গা পায়না কোথাও। বাড়তির মুখে খাপছাড়া লাগে। প্রকাণ্ড দেহ নিয়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে বেড়ায়।

বাড়ির দরজায় বসে গব্‌গব্‌ ক'রে ছোকরা তরমুজের টুকরো খাচ্ছিল। খিদিরপুরের বড় রাস্তার অঞ্চল ছেড়ে বাজার পার হ'তে হ'বে। তারপর সরু গলির দু'পাশে দরজীখানা, মনোহারী ইত্যাদি আনুষঙ্গিক জীবন যাপনের। গলির মধ্যে থেকে গলি—সেখানে একখানা উঠান ঘিরে কতকগুলি ঘরের সমষ্টি। পাকা দেওয়াল—মেজে, টিনের ছাউনি। খাবার জল আসে রাস্তার টিউবওয়েল থেকে। প্রাতঃকৃত্যাদির ব্যবস্থা সর্বসাধারণী। বস্তি।

অবশেষে নেমে এলাম বস্তিতে ? গ্রীক ফোরাম্‌ ছেড়ে ? কিন্তু আমার—আপনার মত অনেকে যে বস্তিতে নেমে এসেছে, তাদের বাদ দেব ?

বস্তিসাহিত্য বহু লেখা হয়েছে—গণসাহিত্য নামেই এযাবৎ তারা চলেছে। যেন নীচুতলার মানুষকে নিয়ে কলম কণ্ডুয়ন মানেই গণসাহিত্য। যেন তাদের চরম অধঃপতন, নোংরামি, ইতরামি লিখলেই

বাস্তবতাধর্মী হয়। এঁরা অন্য দেশকে মাথায় তুলে নাচানাচি করেন, তাঁদের গণসাহিত্য কি পড়েও দেখেন না?

যাই হোক, আমার দুরাকাঙ্খা নেই। আমি শুধু একটি মনের কথাই বলতে চাই, যে মন ছিল কুণ্ঠিত। দরজায় দরজায় ধাক্কা খেয়েছে, তার পক্ষে স্থানাভাব ছিল। কারণ, একটু বেশি জায়গা লাগত কিনা ওর।

বস্তিও আঁকাবাঁকা—যেন মানুষেরই মন। ছেলেটা দরজায় সকালে বসে তরমুজ খাচ্ছে। মোড়ের কাটাফলওয়ালা পচে ফেলে দেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে দু'পয়সায় ছেড়েছে। কাছেই ফ্যাক্টরি—সেখানে শ্রমিকেরা ক্ষুধার প্রহরে কাটাফল কিনে হাউ হাউ ক'রে খায়। কলেরার অজুহাতে কলকাতায় কাটাফল নিষিদ্ধ হলেও এখানে চোরা বাজার বসে।

তরমুজের বাকলা ফেলে দিতে গিয়ে ছেলেটার হাতে লাগল খোঁচা। মহাবিরক্ত হ'ল সে। চোদ্দ মাস আগে যখন সে এসেছিল এখানে তখন এত খোঁজা খেত না। জামাকাপড়ও লাগত না এত বড় মাপের। ক্ষুধাও এত পেত না।

পদ্মাপার বিতাড়িত ছেলেটার নাম মহানন্দ চক্রবর্তী। আমরা তাকে 'আনন্দ' ডাকব।

'মা' বলে একদা যাকে ডাকত, সেই মাসীকে মনে পড়ে গেল ওর হঠাৎ। মা পঞ্চম সন্তানের জন্মদানের পরে অসুস্থ হওয়াতে মায়ের বৈমাত্রেয় বিধবা বোন এসেছিল শুশ্রূষাকারিণীরূপে। মা উঠলেন না আর।

পদ্মাপারে ভাঙা-চোরা দু'খানা ঘরে থাকত ওরা। মা মারা যাবার দিন-পনেরো পরে গাদাগাদি ক'রে চার ভাই বোনকে একঘরে দেওয়া

হ'ল। মাসী তিন মাসের মাতৃহারা বাচ্ছাটিকেও তের বছরের বোনের গলায় গছিয়ে দিয়ে গেলেন রাত্রে। তারপরে বিধবা মাসী তাদের চোখের সামনে সদ্য বিপত্নীকের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন।

রাত্রের পর রাত্রে এই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হতে লাগল। বিবাহের প্রয়োজন হ'ল না মোটে।

মহানন্দ ব্যাপার দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল। ক্রমেই মাসীর যেন 'ভাবন' দেখা দিল। বিধবা মানুষ ; ধুতি পরা চট ক'রে ছাড়তে পারে না, কিন্তু লুকিয়ে মাছ খেতে সুরু করেছে। পাতা কেটে চুল বাঁধা, গায়ে চারবার সাবান মাখা, ঘন ঘন আয়নায় মুখ দেখা চলল।

কাজ-কর্মে অরুচি দেখা দিল ঘোরতর। সকালে মহানন্দ স্কুলে যায়। গরম ভাত না খেলে পাঁচ মাইল হাঁটা পোষায় না। মাসী তাচ্ছিল্যে বলে, "ঘরে পান্তা ঢাকা আছে, খেগে যা।"

ফিরে এলে নিভন্ত উনুনে আবার ভাতের হাঁড়ি বসানো থাকে না। কড়্‌কড়ে ভাতের কাঁসি মাটির মেজেয় পড়ে থাকে। কোনদিন বা বেড়ালে মাছ খেয়ে যায়। মাসী তখন পাড়ায় পাড়ায়।

জমিদারী সেরেস্তায় বাবার কাটে সারাদিন। সকালে উঠে জলপান খেয়ে যায়। দিনের খোরাক ওখানেই। সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে। ঘর-কন্নার খোঁজ রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

রাত্রে ছোট খোকা লাথি দেয় ঘুমের ঘোরে, সদ্যজাত কেঁদে আকাশ মাথায় তোলে। বড় বোন সেটাকে থামাতে না পেরে অকথ্য ভাষায় মা-মাসীকে গালি দেয়। ছোট বোন শয্যা-মূত্রের রোগী। মহানন্দের রাত কাটানো দায়।

ক্রমে ক্রমে অবস্থা খারাপ হতে লাগল। মাসী কানে সোনার মাক্‌ড়ি পরল, এতদিন তোলাই ছিল। একদিন দেখা গেল মায়ের

বালাজোড়া মাসীর হাতে উঠেছে। গলায় সরু বিছে গড়াতে বাবার দেনা হ'ল। শোনা গেল, বাবা জামিরতার পণ্ডিতের কাছে যাতায়াত করছেন বিধবা বিয়ের পাঁতি নিতে।

মহানন্দ তখন পনেরোয় পা দিয়েছে, গ্রামের ছেলে হিসাবে মাত্র ক্লাস নাইনে পড়ে।

বাবা একদিন ডেকে বললেন, "ওরে মহানন্দা, শোনস্। বসা বসা করস্ কি ? ল্যাখাপড়া তর হইব না। আমি আর খরচ টানবার পারি না।"

অতএব গাঁয়ের কালু ভুলুর সঙ্গে মহানন্দ এক টিনের স্যুটকেশ হাতে ঝুলিয়ে সিঙ্গিপুরের কারখানায় এসে লাগল। বস্তিতে বাসা হ'ল তার।

এটুকু মহানন্দের গল্প। অতঃপর এল আনন্দ।

সুধা বলল, "তোমার নামটা বিদঘুটে। আনন্দ বলে ডাকব।"

ছোট ঘরখানায় ঘরজোড়া খাট পাতা—বিবর্ণ হয়ে গেছে কাঠ। এককালে হয়তো দামী ছিল। সুধার মায়ের বিবাহ-শয্যা। ছোট ঘরখানার বাকী অর্ধেকে একটা টিনের চেয়ার, কেরোসিন কাঠের টেবল্। পুরনো খবরের কাগজ পাতা; বই, দোয়াত-কলম থেকে চশমার খাপ, ছুঁচ-সুতোর বাক্স, সর্বাশ্রয় টেবল্খানা। অন্যদিকে বেঞ্চে হাঁড়ি কলসী। গোটা সংসারের তৈজসপত্র রয়েছে খাটের নীচে। হামাগুড়ি দিয়ে হাতড়ায় সুধা।

দাদা কারখানায় কাজ করে, বাবা মুদিখানায় হিসাব লেখে। বৌদি দাদার মার সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে গেছে। সুধা গৃহিণী। সবই করতে হয় তার। ছোট রোয়াকে রান্না চড়েছে। তাকের

ওপর রাঁধা ভাত-তরকারী। আনন্দ উঠানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। সুধা ছ্যাঁক্ছ্যাঁক্ ক'রে ছু'তিন টুক্রো পটল ভেজে তুলল। তারপর হাত ধুয়ে পিতলের সরায় জল গরম করতে দিল।

"আমরা একটু চা খাই, কি বল, আনন্দ? আজ যেতে দেরী হবে। দাদা—বাবা ফিরবে না সকালে।"

খাটের নীচে হাতড়ে হাতড়ে কাপ-ডিস্ নিয়ে এল সুধা, "রাসের মেলায় কিনেছি। কোণা-ভাঙা বলে তিন আনায় দিল। কেবা দেখছে ভাঙা?"

গুড় সহযোগে পাতা চা সুধা দিনে কয়েকবার সেবন করে। এই একমাত্র বিলাস ওর।

প্রথম দিন থেকেই আনন্দের সঙ্গে আলাপ হয়েছে সুধার। বছর ছুয়ের বড় সুধা। আনন্দকে মাঝে মাঝে তাই শাসন করে। দরকার হলে দেখাশোনাও করে। জ্বর হলে বার্লি সাবু রেঁধে আনে। কালু ভুলুদা তো সারাদিন বাড়ি থাকে না। কাজেই একঘরে থাকলেও পাত্তাও নেয়না আনন্দের।

উঠানেই উবু হয়ে বসে পড়ল আনন্দ। আগে ভারী অস্বস্তি লাগত, এতটুকু জায়গায় এতোগুলো লোক থাকে কেমন ক'রে? চলতে ফিরতে ধাক্কা লেগে লেগে শেষ হত আনন্দ। হাত-পা সামলাতে পারত না। এখন অস্বস্তি গেছে, কিন্তু অসুবিধা রয়েছে। খাপ খাওয়াতে পারছে না আনন্দ, নিজেও বড় হয়ে যাচ্ছে কি না।

চা খাওয়া এখনও অভ্যাস হয়নি ওর। রস পায়না তেমন। ক্ষিদেটা বশে থাকে বটে। মন প্রাণ সর্বদা খাই খাই ক'রে না। এখানে ওখানে কুড়িয়ে খেতে হয় না। গুড়ের চাটুকু দিয়ে সুধা ওর ক্ষুধা মেটায়। চায়ে চুমুক দিতে দিতে আড়চোখে সুধার দিকে চেয়ে

দেখতে লাগল আনন্দ। ছিটের সবুজ জামা, সবুজ পাড় একখানা শাড়ী। মোটা খাটো হলেও সাবান কাচা পরিষ্কার। চুলটি চ্যাপ্‌টা খোঁপায় বাঁধা, পরিচ্ছন্ন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করতে হলেও সুধা আগোছালো থাকে না। কপালে কুমকুমের টিপ পর্যন্ত দেওয়া চাই।

কাপটা ধুয়ে রেখে আনন্দ ভাবল, আজ কাজ থেকে ফিরবার মুখে সুধার জন্য একঠোঙ্গা বাদামভাজা নিয়ে আসবে। সুধার সূক্ষ্ম পছন্দ জলভাজাতে তৃপ্ত হলেও অন্য খাদ্য সুধাকে যোগান উচিত মাঝে মাঝে।

ত্রিদিবের প্রায় অচেতন শরীরটা গলির মধ্য দিয়ে অন্ধকার রাত্রে কয়েকজন লোক বহন ক'রে আনছিল। কারখানা থেকে ফেরার পথে আনন্দের সঙ্গে ছোট গলির মুখে ধাক্কা খেল তারা।

দিনের বেলা অনেক কিছুই দেখে আনন্দের কখনও অবাক লাগে। কিন্তু, সন্ধ্যার পরে সে প্রায় অন্য মানুষ হয়ে যায়। যেদিন থেকে বিধবা মাসীকে মায়ের মৃত্যুর পনেরো দিনের মধ্যে রাত্রে বাবার ঘরে দোর দিতে দেখেছে, সেদিন থেকে কিছুতেই আর অবাক হয় না সে। রাত্রে মানুষ বহু কাজই করতে পারে এবং ক'রেও থাকে, যা রাত্রেই করা চলে।

সুধার কথা ভাবছিল আনন্দ। কি জন্য সুধা তাকে এত যত্ন করে, খোঁজ নেয়? সুধার বয়স হয়ে গেছে, দেখতেও ভাল নয়। টাকা বা দেখে দেবার অভাবে বিয়ে হয়নি। বাপ-ভাইয়ের দাসীবৃত্তি ক'রে সারাদিন পরিশ্রমে কাটায়।

সুধার চোখ দুটি কিন্তু সুন্দর টানাটানা। চোখে চোখ পড়লে

কেমন বুকের মধ্যে সিরসির ক'রে ওঠে। সুধা যেন কিছু বলতে চায়। 'সুধাদি' বলে ডাকতে হলেও, বয়সে বড় হলেও সুধা ছোট—তার পাশে দাঁড়ালে বুকের কাছে জামা ছোঁয়।

সিনেমায় দেখা ছবিগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। দেশে মাসীর হাবভাব মনে পড়ে। সুধাকে নিয়ে কি যেন একটা করতে হবে ?

স্বপ্নের মধ্যে ডুবে পথ চলছিল আনন্দ। ধাক্কা খেয়ে সজাগ হ'ল। বস্তির জীবনে অনেক রাত্রে এমনভাবে বয়ে আনতে হয় কাউকে কাউকে। চিন্তিত হ'ল না সে। শুধু ভাবল, কত নাম্বারের আজ মাতাল হবার পালা।

লোকগুলোর সঙ্গে ঢুকে এল উঠানে আনন্দ। কিন্তু তারা চলল সামনের ঘরগুলোর পেছনে। আনন্দ নিজেদের ঘরখানার তালা খুলল। কালু ভুলুদা এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে না। ওবেলার ভাত আছে, খেয়ে নেওয়া যাক। তারপরে অন্য কিছু।

কলের পোশাক ছেড়ে, হাতেমুখে জল দিয়ে খেতে বসবে এমন সময়ে দৌড়ে এল সুধা, "আনন্দ, একটু এসো। তাড়াতাড়ি আছে।"

সুধাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল আনন্দ, কিন্তু সুধার কথা বলবার সময় নেই, চোখের পাতা ভিজে।

"এস না। হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? যেন একটি বৃষকাঠ।"

আনন্দ চমকে উঠল। সুধা এমন সুরে তো কথা বলে না কখনও।

"চল, সুধাদি।"

বস্তির মধ্যে সরু—সরু দুর্গন্ধময় নোংরা গলি ঠেলে সুধা ওকে একেবারে পেছনে নিয়ে এল। ত্রিদিবদার ঘর। সে কি, শেষে ত্রিদিবদাও মাতাল হয়ে এলেন ? সপ্তাহে তিনদিন ত্রিদিব রায় এখানে

স্কুল করেন ছোটদের আর অশিক্ষিতদের জন্য। সপ্তাহের বেশির ভাগ সময় তাঁকে এখানে ফিরতে দেখা যায় না। তবু আড়ালে নিরালা ঘরখানায় একটা তালা বন্ধ থাকে। রাস্তা থেকে ঘরখানা ধরা পড়ে না।

ত্রিদিবদার ঘরেও নয়। ত্রিদিবদার ভাঙা কাঠের আলমারীটা সরানো হয়েছে। ছোট একটা গুহাঘরের অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে, চোরা একপাল্লা কাঠের দরজার পেছনে। টিম্‌টিম্‌ ক'রে আলো জ্বলছে ওই ঘরে।

এমন একটা ঘরের সন্ধান পেয়ে আনন্দ অবাক্‌ হ'ল। ত্রিদিবদার ঘরে সে বহুবার এসেছে। সুধা ত্রিদিবদার স্কুলে পড়ে। সুধা এনেছে তাকে। কিন্তু ত্রিদিবদার ঘরের মধ্যে যে আস্ত একটা চোরা কুঠুরি লুকানো আছে, জানত না সে কোনদিন। আলমারী দিয়ে দরজাটি ঢাকা থাকত কি না।

অন্ধকার চাপা সেই ছোট ঘরটা নীচু—ইলেকট্রিক নেই। দরজার কাছে এগিয়ে আনন্দ যা দেখল, স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ছোট ঘরটা একটা ডাক্তারখানার মত সাজানো। দেওয়ালের গায়ে আলমারীতে ঔষধের শিশি; বোতল, মলমের কৌটা। কোণে ষ্টোভে ফুটন্ত জলে কতকগুলো যন্ত্রপাতি ফুটোনো হচ্ছে। সরু বেঞ্চের ওপর ব্যাণ্ডেজ, তুলোর বাণ্ডিল সাজানো।

সেখানে মেজের নারিকেল ছোবড়ার গদির ওপরে ত্রিদিবদা পড়ে আছেন মরার মত। মাথার শিয়রে টুলে একটা হ্যাচাক্‌ লণ্ঠন,—নেভানো। দরকার হলে তবে জ্বালানোর জন্য নিশ্চয়। লোকগুলোর মধ্যে একজন মাত্র বসে আছে ষ্টোভের কাছে, যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত সে।

সুধা বলল, "তোমাকে বাধ্য হয়ে ডেকেছি, আনন্দ। ত্রিদিবদার

জন্যে এখন লোকের দরকার। এদিকে এসে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেল। আমি দুধ গরম ক'রে নিয়ে আসি।" কিন্তু চলে গেল না সে, মাথার কাছে বসল।

আনন্দ পায়ে পায়ে এগিয়ে যা দেখল ফলে তার মুখ থেকে অস্ফুট আর্তনাদ বার হয়ে গেল। সুধা ধমকে দিল, "চুপ"।

মেজের খানিকটা অংশ রক্তে লাল হয়ে গেছে—ত্রিদিবদার পাঞ্জাবীর কাঁধ-হাতা ভিজে কাল হয়েছে—রক্তের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে—এখনও।

"কি হয়েছে, সুধাদি?"

"গুলি লেগেছে।"

"অ্যাঁ!"

"আবার চেঁচায়!"

"গুলি কেন?"

"দেশ স্বাধীন করা এতই কি সোজা?"

এবার ওপাশের ভদ্রলোক মুখ তুললেন, ভারী-ফ্রেম কালো চশমা চোখে! বললেন, সুধা, এ বিষয়ে কোন কথা বোল না। তোমার নাম আনন্দ, না? শোন, ত্রিদিবদা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। লোক জানাজানির ভয়ে আমরা ওঁকে বাইরের ডাক্তার দেখাতে পারছি না। যা করণীয়, আমাদেরই করতে হবে। তাই তোমাকে ডাকা হয়েছে।

"কি করব?"

"গুলিটা বার ক'রে ফেলতে হবে। আমি ছুরি চালাব, তুমি ধরবে।"

"অ্যাঁ।"

সুধা আনন্দকে একটা সজোরে ধাক্কা দিল, "হাবার মত কোর না।"

সুধার ধাক্কায় আনন্দ অসামাল অবস্থায় হুড়মুড় ক'রে দেওয়ালে ঘা খেল। কনুই-এর কাছের চামড়া উঠে গেল বুঝি।

ভদ্রলোক একটু হাসলেন, "আমি ডাক্তারী, সার্জারী কিছু কিছু জানি।"

পাঞ্জাবীর হাতা রক্তে ভিজে বসে গিয়েছিল। কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলতে লাগলেন তিনি। আনন্দ কাঁপা হাতে হাতখানা ধরে রইল। সুধার ধাক্কার ফলে সে আর কিছু বলতে সাহস পাচ্ছিল না।

সুধা মাথায় বাতাস করতে লাগল। হঠাৎ ত্রিদিবদা চোখ মেলে চাইলেন এবং জড়ানো গলায় বলে উঠলেন, "মরফিয়া।"

ভদ্রলোক কাঁচি ছেড়ে আলমারীর পাল্লা খুললেন। সুধার চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল ঝরে পড়তে লাগল।

"তোমাকে তখন ধাক্কা দেবার জন্যে খুব চটে গেছ, না আনন্দ ?"

রান্নাঘরে সুধা ত্রিদিবদার দুধ গরম করছে। তার বাবা ভাই কেউ ফেরেনি। ত্রিদিবের ডাক্তারী শেষ হয়েছে। আনন্দ গলির মোড় থেকে দুধ কিনে এনেছে।

"রাগ করব কেন সুধাদি, সারাজীবন তো ধাক্কা খেয়েই কাটালাম। পদ্মাপার থেকে ধাক্কা খেয়ে এখানে এসেছি। এখানেও চলতে ফিরতে ধাক্কা খাচ্ছি। জায়গা পেলাম না। ফেলে দেওয়া খাবার আর ধাক্কা!"

"দুঃখু কোর না। এক্ষুণি চারটি গরম খিচুড়ি রেঁধে দেব। ওই ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত তোমার খেতে হবে না গো। যা কাজটা করালাম আজ তোমাকে দিয়ে। ফেলে দেওয়া খাবার ফেলেই দাও।"

আনন্দের মুষড়ানো মন তৃপ্ত হয়ে উঠল। সুধাদি এখনও তার কথা ভাবছে।

সুধাদি ত্রিদিবের কষ্ট দেখে অমন ক'রে কাঁদল কেন? তাহলে

সুধাদি কি ত্রিদিবদার কাছে কিছু চায় ? সুধাদি আনন্দের কাছে প্রার্থী নয় কি ? অথচ দিনে রাত্রে সুধাদির হাসি কথার মধ্যে আনন্দ ইঙ্গিত খুঁজে পেয়েছে। এখনও এই তো শাড়ীর আঁচল উড়ছে আনন্দের গা ছুঁয়ে। আগুনের আভায় রাঙা মুখে বিদ্যুৎ জ্বলছে। সে কি মিথ্যা ? সুধাদি জলভাজা ভালবাসলেও ত্রিদিবদার জগতের ধরাছোঁয়ার বাইরের বস্তু নিয়ে কি তৃপ্ত থাকতে পারে ? তার কামনা নিশ্চয় আনন্দের মত বাস্তব।

উনুনের ধারে বসেছে আনন্দ প্রকাণ্ড বেমানান দেহ নিয়ে। গরম রান্নাঘরে সারাদিন পরিশ্রমের পরে দেহও তার গরম হয়ে উঠছে। সেই শরীর একথালা ভাত, দুটো পাজামা-সার্টের পরেও অন্য কিছু চায়। ইন্দ্রিয়ের উর্ধের জগৎ সে জানে না, তাই হাত তার রক্ত মাংসের দেওয়ালে ঘা দিয়ে বেড়ায়।

সুধা দুধের বাটি নিয়ে চলে গেল, "ত্রিদিবদাকে দুধটা দিয়ে আসি। তুমি একটু চোখ রেখো, বেড়াল না ঢোকে।"

তৎক্ষণাৎ ফিরে এল সে, "দুধ দিয়ে এলাম। ওঁর বন্ধু খাইয়ে দিচ্ছেন। বেশ ভাল আছেন এখন ত্রিদিবদা।"

খুশি মুখে সুধা বলল, "এস, একটু চা খাই।"

আনন্দের মনে পড়ে গেল, পকেট থেকে বাদামভাজা বার ক'রে দিল সে। মারূপিনী মাসীর জন্য বাবাকে তেলেভাজার ঠোঙা সে বয়ে আনতে দেখেছে এইভাবে।

সুধার আনন্দ ধরে না আজ, "বা, বেশ হবে গরম চায়ের সঙ্গে।"

সুধা খুশি কেন ? রান্নাঘরে সে বসেছে বলে, না ? সুধা আনন্দের কাছে সেই বস্তু চায়, যা আনন্দের মাসী ভগ্নিপতির কাছে চেয়েছিল। যুগে যুগে নারী পুরুষের কাছে ওই ভিন্ন কিছু চাইতে জানে না।

ভাল কথা। তাই হবে। আনন্দের প্রথম পুরুষসত্তার উদ্বোধন হোক সুধা-সাগরে।

চায়ে চুমুক দেবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামার শব্দ পাওয়া গেল। একটি মেয়ে বস্তির মধ্যে এসে বিপন্নভাবে চারদিক চাইতে লাগল। এমন একটি মেয়ে, সে আগে কখনও বস্তি দেখেনি, বস্তিও তাকে দেখেনি।

মেয়েটি সুধার দিকে এল, "এখানে ত্রিদিব ব্যানার্জি আছেন ?"

"হ্যাঁ, আপনি কি ওঁর কাছে"—সুধার ভীতু প্রশ্নের উত্তর দিল সে, "হ্যাঁ, আমি করুণা।"

"ওঃ" সুধা যেন নিভে গেল। "আনন্দ, ওঁকে ত্রিদিবদার ঘরটা দেখিয়ে দাও।"

আনন্দ বিস্মিত ভাবে মেয়েটিকে নিয়ে গেল।

ত্রিদিবদার চোরা-কামরা আবার আলমারীর আড়ালে অন্তর্ধান করেছে। নিজের ঘরে ভাঙা তক্তপোষে শুয়ে আছেন তিনি চোখ বন্ধ ক'রে। বন্ধুটি চুপচাপ শিয়রে বসেছিলেন।

করুণাকে দেখে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করলেন।

ক্ষীণস্বরে ত্রিদিবদা বললেন, "এখানেও এলে ?"

সতেজে উত্তর হ'ল, "তবে কোথায় যাব, শুনি। গাড়ি এনেছি, বাড়ি চল। তোমার মা কান্নাকাটি করছেন।"

"থাক, করুণা।"

"না। আমার আর সহ্য হবে না।"

আনন্দ আস্তে চলে এল হাল্কা মনে। ত্রিদিবদার এমন চমৎকার দেখবার লোক আছে, মা আছেন। ভালই। ত্রিদিবদা ভারী উচ্চাঙ্গের লোক।

ত্রিদিব-করুণার মত হোক আনন্দ-সুধা। সুধা ত্রিদিবদার ভক্ত ছাত্রী, তাই তাঁর কষ্ট দেখে তখন কেঁদেছিল। সুধা ত্রিদিবের কেউ নয়। নইলে ত্রিদিবের গুলি খাওয়ার দিনে আনন্দকে নিয়ে এত আহ্লাদ করতে পারে? অসম্ভব। সুধা প্রাত্যহিক দিনের আনন্দের। ত্রিদিবের সুধা নয়।

ফিরে এসে আনন্দ দেখল সুধা চুপ ক'রে বসে আছে। এত সাধের চা তার ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেছে। চায়ে সুধার অরুচি দেখা যায় না। আনন্দ অবাক হয়ে বলল, "চা খেলে না?"

"এই যে, খাচ্ছি" ঠাণ্ডা চা-টা একচুমুকে শেষ ক'রে সুধা কাপ-ডিস ধুতে লাগল নীরবে।

"উনি কে।"

"ওঁর সঙ্গে ত্রিদিবদার বিয়ে হবার কথা আছে। ত্রিদিবদা তো বড়লোকের ছেলে। আমাদের দুঃখ দেখে এখানে স্বদেশী করেন, লুকিয়ে থাকার আস্তানাও চাই একটা। অত বড়লোককে এখানে কেউ খুঁজবে না।"

ভাঙা-ভাঙা গলা সুধার। কাজে যেন হাতে বল নেই। করুণা চলে এল, যাবার মুখে সুধার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "তুমি সুধা না? ত্রিদিব তোমার কত প্রশংসা করে, আজ ওর জন্যে যা করেছ, আমারা চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।" আনন্দ দেখল এই প্রশংসায় সুধা আরও মনমরা হ'ল। আশ্চর্য!

করুণা বলে গেল, "কাল সকালে ওঁকে নিয়ে যাব। আজ নড়াচড়া করা উচিত নয়, বন্ধু বললেন। এবার চোখে চোখে রাখতে হবে। যা কাণ্ড ক'রে আসেন! আচ্ছা, চললাম, ভাই।"

করুণার যাওয়ার দিকে চেয়ে রইল সুধা একদৃষ্টে, আনন্দ ওকে

আনন্দ দেবার উদ্দেশ্যে বলল, "যাক্, ত্রিদিবদা যত্নে থাকবে, কি বল, স্নুধাদি।"

যেন নিজের মনে বিড়বিড় ক'রে স্নুধা বলে চলল, "এসেছে যখন নিয়ে যাবে, জানি! রাগ ক'রে এখানে আসত না। ভেবেছিলাম পুলিশের গুলি খেয়ে ত্রিদিবদার এখানে অনেকদিন থাকতে হবে। চলে যেতে পারবেন না। আমি একটু সেবা করতে পারব। তা-ও হল না।"

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল আনন্দ। তাই আজ স্নুধার এত উল্লাস দেখেছিল সে! ভুল ভেবেছিল সে তাই।

"তুমি এখন কি করবে, স্নুধাদি?"

স্নুধা ততক্ষণ নিজেকে সামলে নিয়েছে, মুখে হাসি টেনে বলল, "কি আবার করব? আমার কি আশা ছিল। উনি করুণাকে বিয়ে করুন। ওঁরও তো আমার মত স্নুখ চাই। আমি ওঁর কাজ ক'রেই স্নুখ পাব।"

হঠাৎ আনন্দ ধরা গলায় বলে উঠল, "আর, আমার কি হবে?"

স্নুধা বিস্ময়ভরা স্বরে বলল, "তার মানে? ও, তুমি বুঝি ভেবেছ আমি ত্রিদিবদার বাড়ি গিয়ে কাজ ক'রে থাকব। দূর পাগলা! আমি এখানেই থাকব। আর তুমি আমার ছোট ভাইটি হয়ে থাকবে। আমার একটা ছোট ভাইয়ের বড় শখ ছিল, আনন্দ।"

এবারে জীবনের মত শেষ ধাক্কা খেল আনন্দ। কিন্তু এ ধাক্কায় ছিট্‌কে পড়ল না সে।

স্থানাভাব যার ছিল, সে স্থান পেল। সঙ্কীর্ণ গৃহকোণে নয়— অনন্ত আকাশের বিরাট ব্যাপ্তির বুকে।

নতুন বাড়ি হয়েছে। তাতে মার্বেল বসলো না। স্বামী শেষ পর্যন্ত টাকায় কুলিয়ে উঠতে পারলেন না। অথচ, আমার ছিল চিরদিনের শখ, আর কোথাও না হোক, বসার ঘরটিতে শাদা-কালো চেক্‌বোনা মার্বেল-পাথর। বিবাহের সময়ে যৌতুক পেয়েছিলাম আসবাবপত্র কিছু কিছু। সাজিয়ে রাখবো।

কপাল মন্দ আমার, বলতেই হবে। মা-বাবা খরচপত্র করতে ত্রুটি করেন নি। আদরের সন্তানই তো ছিলাম। তায় গায়ের রং আমার বেশ ফর্সা বলতেই হবে। কিন্তু বিয়ের পরে উঠতে হ'ল গলির মধ্যে দু'খানি ভাড়াটে ঘরে। পা ফেলতে ঘেঁষাঘেঁষি।

তা, আমি শুনিয়ে দিয়েছিলাম বইকি। স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তার দ্বিতীয় রাত্রেই মুখ খুলেছিলাম। দিব্যি চিপ্‌টেন কেটে মধুর বচন শুনিয়েছিলাম, "এতগুলো লোকজন, দু'খানা ঘরে থাকতে কেমন ক'রে? এখনই বা কি ভাবে থাকা হবে, শুনি? আমাকে নিশ্চয় দশ বারোজন লোক নিয়ে শুতে হবে না?"

স্বামী বড় লজ্জা পেলেন, "বাড়ির যা অবস্থা কলকাতায়, জানো তো নিশ্চয়? তোমাদের নিজের বাড়ি আছে। তা, তোমার একখানা আলাদা ঘব মিলবেই, ভয় পেয়ো না।"

আমার সাহস আছে, বলতেই হবে। আমি উত্তর দিলাম, "ঘর-দোরের ছিরি দেখে ভরসাই বা কোথায়? তা, আমি বলিকি, বিয়েতে তো টাকা-কড়ি পেয়েছ ঢের। বাঁচিয়ে-টাঁচিয়ে একখানা বাড়ির জমি

কিনে রাখো এখন। পরে না হয়, ঘর তুলো।"

স্বামীর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল, আস্তে আস্তে বললেন, "টাকাকড়ি মা খরচ-পত্তর করছেন। আমার বাঁচাতে চাওয়া কি ভাল দেখায়?"

বিধবা শাশুড়ী আমার। দুটি-তিনটি দেওর-ননদ। তা'ছাড়া, ভাগ্নী তার স্বামীসহ শিকড় গেড়ে বসেছে। কি করা যায়? বললাম, "উনি মেয়েমানুষ। টাকাকড়ির হিসাব-পত্তর কি ঠিকমত বোঝেন? কিছু সরিয়ে রাখো না। এ বাড়ি দেখে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, বাবাঃ।"

স্বামীর আর যা হোক, রাগ নেই, বলতেই হবে। বিনীত নম্র স্বরে বললেন, "বাড়ির ব্যবস্থা তোমার আমি করবো। তুমি ভয় পেয়ো না। তোমার বাবার টাকা নিতে হবে না। যা পারি, কুঁড়ে হোক, ভাঙাচোরা হোক, তোমার বাড়ি হবেই। কিন্তু আজকের রাত কি শুধু এই রকম কথা বলার রাত? আজকে এমন সব কথা বোল না।"

উনি রাগ করলেন না দেখে কিছু অবাক হলাম। আমার মা-বাবার মধ্যে এমন ধরণের সাংসারিক কথা বলতে শুনেছি। তার ফলে শুনেছি বাবার চিৎকার, মায়ের ঝগড়া। কই, ইনি তো বাবার মত রাগ করলেন না?

উনি আমার কাছে এসে বসেছেন ততক্ষণে—খুবই কাছে। তারপর বিবাহিত দম্পতীর চিরাভ্যস্ত খাদে বইতে শুরু হ'ল জীবনের স্রোত। নিজের ভাগ্যকে আর তেমন মন্দ বলে মনে হ'ল না।

না, লোকটি প্রেমিক বটে, বলতেই হবে।

বিয়ের চার পাঁচ বছরের মধ্যেই আমার বাড়ি হ'ল স্বামী কথা

রাখলেন। ইতিমধ্যে বাঁধা কাজ ছেড়ে তিনি ঠিকেদারির কাজ নিয়েছিলেন। বাড়ি ক'রে তবে ক্ষান্ত হলেন। বাবা জামাই বেছেছিলেন নেহাৎ মন্দ নয়।

নতুন পাড়ায় উঠে এলাম। জমি বেশ খানিকটা রাখা হয়েছিল। সবটাতে বাড়ি তোলা কিন্তু এখন হয়ে উঠল না। মোটামুটি ক'খানা ঘর তোলা হ'ল—বাকি জায়গা ফেলে রাখা হ'ল ভবিষ্যতের আশায়।

আমার ইচ্ছামত সামনে একখানা বসবার ঘর রাখা হ'ল বড় করে। ইতিমধ্যে ভাগ্নী ও ভাগ্নী জামাইকে অন্যত্র সরিয়েছিলাম। এক দেওর চাক্‌রি নিয়ে বাইরে সরেছিল। শাশুড়ী গিয়েছেন সেই ছেলেটার সঙ্গে। সুতরাং, বেশ স্বচ্ছল জায়গা পেলাম নতুন বাড়িতে, বলতেই হবে।

কিন্তু ভাই, মনে সুখ কই? চারপাশে সকলে গৃহস্থ মানুষ, গৃহস্থ ধরণের বাড়ি-ঘর ওদের। আমার বাড়িও চারপাশের সঙ্গে মানানো। অসমাপ্ত বাড়িখানা আমার পাড়ায় কিছু বেমানান হ'ল না।

কিন্তু, মনে যে আঁকা রয়েছে বাপের বাড়ির পাড়ায় লাহাদের বিরাট বাড়ির ছবি। ঘরে ঘরে শাদা-কালো মার্বেলের মেজে। দুপুর বেলা দাসী মুছে দিয়ে যায়—বৌয়েরা তাস খেলে, কড়ি চালে। ঘুমোয় কখনও—দীর্ঘ দিবানিদ্রা। বাড়ির গাড়ি সর্ব্বদা হাজির। বিকেল বেলায় চুল বাঁধুনির কাছে চুল বাঁধে, বাঁধা রোজের নাপতিনী ঝামায় ঘষে মেজে আলতায় পা দু'খানি টুক্‌টুকে ক'রে দেয়। একগা গয়না পরে ওরা পাল্টে-পাল্টে নিত্য নতুন। শাড়ী বাছে শান্তিপুরী-ঢাকাই-টাঙাইলের গাদা থেকে। শাদা মার্বেল লাল আলতার ছোপ ধরিয়ে বারান্দায় চটি পরে রেশমের। তারপরে সকলে গাড়ি চড়ে বেড়াতে বার হয়।

আমার ঠাকুমা ছিলেন লাহা-বাড়ির সই। ওঁর সঙ্গে যেতাম

ওবাড়ি আমি প্রায়ই। স্কুলে যাওয়ার পাট ছিল না আমাদের পরিবারে। কাজেই, কোথাও পা বাড়াতে পেলে আমি ছাড়তাম না।

শৈশবে মনে ছাপ পড়ে গেছে লাহা-বাড়ির। ঘরে ঘরে মার্বেল। মনে সখ ছিল ওমনি একখানা বাড়িতে থাকব। মার্বেলে পা ফেলে ফেলে চলব। হ'ল কই আমার বরাতে? আমার বাড়ি এই গৃহস্থ-পাড়ায় মন্দ নয় নেহাৎ। কিন্তু, মনে যে ছবি তোলা আছে লাহাবাড়ির —আমার আদর্শ। প্রতিমুহূর্ত তুলনায় ম্লান হয়ে যায়।

গাড়ি হয়েছে বটে আমার। ভাঙাচোরা, সেকেণ্ড হ্যাণ্ড সস্ত ফোর্ড। ড্রাইভার নেই। স্বামী নিজে নিয়ে চালিয়ে সারা দিন টো-টো ক'রে ফেরেন। আমার গাড়ি চড়ে বা'র হওয়া ঘটে না। ঠিকেদারির কাজে সারা কলকাতা চষে ফেলতে হয় ওঁকে। কিছু বললেই বলেন, "একটু সময় দাও, লক্ষ্মীটি। এর পরে মিনার্ভা গাড়ি চড়ে তোমাকে নিয়ে বেড়াব।"

যাই হোক, নতুন পাড়ায় নতুন বাড়িতে দিন কাটছিল মন্দ নয়, বলতেই হবে। প্রতিবেশী খুব মিশুকে, বিশেষতঃ পাশের বাড়ির লোকেরা। দেখতে দেখতে আলাপ জমে উঠল বেশ। প্রায় আত্মীয়ের মত হয়ে গেলেন ওঁরা। পাড়াগাঁয়ে বাড়ি, চাকুরির খাতিরে কলকাতায় বাড়ি ক'রে আছেন ওঁরা। বাড়ি ভর্তি লোকজন, নিকট ও দূর সম্পর্কের। কর্তা-গিন্নী দু'জনেই অমায়িক স্বভাবের। দেশ থেকে আত্মীয়-স্বজনের আসা লেগেই আছে। বাড়িতে নতুন কেউ এলেই এ বাড়িতে দেখা করতে আসতেন।

সেদিন বিকেলের দিকে ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। স্বপ্ন দেখছিলাম মার্বেলের প্রাসাদে আমি বাস করছি।

চারপাশে আমার ধবধবে শাদা মার্বেল। মাথার ওপরেও মার্বেল। পায়ের নীচে মার্বেল। সেই মার্বেল যেন শাদা বরফের পাহাড়, আর তা থেকে ধোঁয়ার মত কুয়াসার স্রোত বইছে। হাত-পা ঠাণ্ডা ক'রে দিচ্ছে হিমেল বাতাস।

ঘুম ভেঙে উঠে দেখি, কোথায় সে মার্বেল প্রাসাদ? আমার আধগড়া ছোট বাড়িটায় শুয়ে আছি। সিমেণ্টের কটকটে মেজে, ছোট ছোট ঘর।

মনে মনে ভাবলাম, আমার ভাগ্যে কি এর চেয়ে আরও একটু ভাল হ'তে পারত না।

ঝি এসে খবর দিল, পাশের বাড়ির লোক এসেছেন বেড়াতে। বাইরের ঘরে বিয়ের আসবাব-পত্র সাজিয়ে দিব্যি ড্রইং-রুম বানিয়েছিলাম। ওঁদের ওখানে বসালাম।

পাশের বাড়ির বিধবা পিসির মধ্যবয়সী বিধবা ননদ। চিকিৎসা করাতে এখানে এসেছেন। পিসি যথারীতি এ বাড়িতে বেড়াতে এনেছেন।

কোরা থান পরনে ভদ্রমহিলার, ছোট ক'রে ছাঁটা চুল। হয়তো ধোবা বাড়ির কাপড় বাক্সে ছিল না এই মুহূর্তে। মুখের ভাব বেজায় নিরীহ।

আলগোছে কেমন ভয়ে ভয়ে সোফায় বসলেন। সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে চারদিক দেখতে লাগলেন। পিসি আমার পরিচিতা। কথাবার্তা পিসিই চালাতে লাগলেন।

আমার ভদ্রতাজ্ঞান যথেষ্ট, বলতেই হ'বে। বাড়িতে লোক এলে আমি এত যত্ন করি যে তারা শত মুখে আমাকে ধন্য ধন্য করে। শাশুড়ীর আমলে লোককে এক কাপ চা দেবার রেওয়াজ ছিল না।

আমি নতুন লোক আসা মাত্র চায়ের সঙ্গে খাবার-পাত্র দেবার ব্যবস্থা করি। লোকে দেখুক আমার কেমন দিলখানা। হুঁ!

আজও বাইরে গিয়ে বিধবাদের উপযুক্ত খাবারের যোগাড় ক'রে চা দিতে বললাম। ঘরে ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম পিসির ননদকে, "কি ব্যামো আপনার?"

"অম্বল মা, অম্বল। গলাবুক জ্বলে সর্বদা। অম্বলের জ্বালায় মরি।"

"এতো স্বাভাবিক আমাদের ঘরে। আলো-চাল, ডাল-বাঁটা খেয়ে খেয়ে আমাদের বিধবাদের এমনি অম্বলের ধাত হয়।"

আমার কথায় পিসির ননদ মাথা নামালেন। পিসি চুপ ক'রে রইলেন।

এমন সময়ে হঠাৎ ভদ্রমহিলার কাশি উঠল—শুকনো অম্বলের কাশি। মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল, প্রায় দম বন্ধ হয়ে যায় আর কি।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। এখন কি করা চলে? পিসি ব্যাকুল হয়ে এধার ওধার চাইতে লাগলেন। আমি তাড়াতাড়ি নিজেই এক গ্লাস জল নিয়ে এলাম।

ভদ্রমহিলা কাশতে কাশতে ততক্ষণে সোফা থেকে মাটিতে বসে পড়লেন। চোখে জল এসে গেছে ওঁর যন্ত্রণায়। 'উঃ—আঃ' অস্ফুট শব্দ অজ্ঞাতসারে ওঁর মুখ থেকে বার হচ্ছে। কি বিপদেই পড়লাম! গেঁয়ো লোকেরা এমন রোগীকে নিয়ে অন্য বাড়ি বেড়াতে আসে কেন?

এমন সময়ে ঝি আমার হুকুম মত ট্রেতে সাজিয়ে গরম চা আর সন্দেশ রসগোল্লা এনেছে। চট ক'রে মনে পড়ে গেল।

আমার কাকীমার এমনি অম্বলের কাশি ছিল। যখনই জঠর খালি হ'ত, এমন কাশি উঠত ক্রমাগত। তিনি তখনই কিছু খেয়ে নিতেন। সঙ্গে সঙ্গে কাশিটাও কমে যেত।

আমি বুঝলাম ভদ্রমহিলার দুপুরের খাবার পাচ্য হয়ে গেছে, শূন্য পাকস্থলীর বিক্ষোভ সুরু হয়েছে।

ওঁর সামনে খাবার প্লেট ধরে বললাম, "এক্ষুনি একটু কষ্ট ক'রে এগুলো খেয়ে ফেলুন। খালি পেট হলেই অম্বলে এমন হয়। আমি জানি। আমার কাকীমার এমনি অম্বলের কাশি ছিল।"

ভদ্রমহিলা বিনা আপত্তিতে খাবার খেতে সুরু করলেন। ওঁর ভাব দেখে মনে হ'ল, এ মুষ্টিযোগটা তিনিও জানেন।

একটুর মধ্যেই কাশি সেরে গেল। সুস্থ হয়ে সোফায় বসলেন উনি।

আমি উপদেশ দিলাম, "যখনি এমনি কাশির ভাব দেখবেন, চট ক'রে কিছু খেয়ে নেবেন, কেমন ?"

পিসি বললেন, "গেরস্ত বাড়ি মা, সব সময়ে কি ঘরে খাবার-দাবার থাকে ?"

আমি উত্তর দিলাম, "খাবার মানে কি ভাল-মন্দ কিছু ? আর কিছু না হয় এক মুঠো মুড়ি দিয়েও জল খেয়ে নেবেন। সকালে বাসিমুখে থাকবেন না কিন্তু।"

গো-চোরের মত আবার পিসির ননদ মাথা নামালেন। রকম দেখ না ? লজ্জাবতী লতা যেন। আ মরণ, তোমার ভালর জন্যেই তো বলা—ওর কিছু উত্তর দেওয়া উচিত, নয় কি ?

যাই হোক, কথাবার্তা আর অগ্রসর হ'তে পারল না। একান্ত অসময়ে স্বামী এসে গেলেন। দু'জনে তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলেন।

আমি চমৎকার ভদ্র ব্যবহার করতে পারি, বলতেই হ'বে।

তারপর কয়েকটি দিন গেল কেটে নিজের কাজে। আমার স্বামী একটা ডবল-আয়নার আলমারী কিনে ফেললেন নীলাম থেকে। অনেক

দিনের শখ ছিল আমার।

আলমারী বসানো, তাতে কাপড়-চোপড় গোছানো, ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলাম। পাশের বাড়ির খবর আর রাখিনি। পিসির ননদের বেয়াড়া ব্যারামটার কি হ'ল, কে জানে?

কৌতূহল মেটাতে সময় পাওয়া মাত্র, গেলাম। গিন্নী যত্ন ক'রে বসালেন। এদিক-ওদিক চেয়ে পিসি বা ননদকে কোথাও দেখতে পেলাম না।

জিজ্ঞাসা করায় গিন্নী বললেন, "উনি একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়েছেন। দেখবেন না, চলুন।"

পিসির ঘরের মেজেয় ননদের ঠাঁই মিলেছে। চুপ ক'রে শুয়ে আছেন তিনি আধময়লা বিছানায়। শিয়রে বসে পিসি। আমাকে দেখে উঠে বসলেত, "আসুন, বসবেন না?"

বসতে আমার ইচ্ছা হ'ল না। অমনি ঘরে, অমনি বিছানায় বসা আমার পোষায় না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, "না, এখনি বাড়ি যাব। বসব না আর। তা' আছেন কেমন?"

ননদ উত্তর দেবার আগেই পিসি বললেন, "আর কেমন? পরশু দিন হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে।"

বুঝলাম চিকিৎসার ব্যয় বহন করার লোক নেই।

"ভাল! হাসপাতালে গেলেই রোগটার ঠিকমত চিকিৎসা হ'বে। সেরে উঠবেন তাড়াতাড়ি। সেই ভালো।" এমনি দু'চারটে ভদ্রতার কথা বলে আমি চলে এলাম। হাসপাতালে যাবার নামে পিসির ননদের ভীতু-ভীতু মুখখানা মনে জেগে রইল।

না, ভদ্রমহিলা একটু বেশি গো-চোর ধরণের নিরীহ মানুষ, বলতেই হ'বে।

বসবার ঘরে চেয়ারের ঢাকনা লাগাচ্ছি, পাশের বাড়ির খোকা এসে টেলিফোনের বইটা চাইল।

"কারুর ঠিকানা দেখবে বুঝি ?"

"হুঁ, পিসির ননদের খুড়শশুরের ভায়রা-ভাই পুলিস অফিসার। ওঁর ঠিকানা দেখতে চাচ্ছেন বাবা।"

বইটা হাতে দিয়ে বললাম, "পিসির ননদ হাসপাতাল থেকে ফেরেননি ?"

খোকা অবাক হয়ে গেল, "ফিরবেন কি ক'রে ? উনি তো আজ সকালে মারা গেলেন ?"

"বল কি ? মারা যাবার অসুখ তো হয়নি ওঁর ! এত তাড়াতাড়ি ?" আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

"অপারেশন করা হয়েছিল ! আর জ্ঞান ফেরেনি !"

"অম্বলের অসুখে অপারেশন ! তোমার বাবা শ্মশানে যাননি ?"

"সেই নিয়েই তো গোল। হাসপাতাল থেকে ডেড-বডি ছাড়ছে না।"

"সেকি কথা ? এরকম তো—"

বাধা দিয়ে খোকা বলল, "আমি সব কিছু জানিনা। আমি তাড়াতাড়ি যাই। দেরী হ'লে বাবা বকবেন। আপনি আসুননা। পিসি কাঁদছেন।" ছুটে চলে গেল ও।

আমি ভেবে দেখলাম, এক্ষেত্রে প্রতিবেশী হিসাবে আমার যাওয়া উচিৎ কর্তব্যের খাতিরে। পরনে ছিল একখানা জরিপাড় শাড়ি—গোলাপী রংয়ের। তাড়াতাড়ি খুলে ফেলে গেলাম শাদা একখানা মিলের শাড়ির সাজে।

পিসি কাঁদছেন মুখ ঢেকে। গিন্নী সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কর্তা অন্যান্য পুরুষের সঙ্গে উত্তেজিত ভাবে কথাবার্তা বলছেন। হয়তো শব সৎকারের

ব্যবস্থা হচ্ছে।

আমাকে দেখে পিসি ডুকরে উঠলেন, "এসো মা, এসো। তুমি সেদিন ওকে কত যত্ন করেছিলে। তোমার কথা প্রায়ই বলত। বলেছিল, সেরে উঠে আবার তোমার বাড়ি যাবে। তা, আর ওর সেরে ওঠাই হ'লনা।"

কিছুক্ষণ কেঁদে নিয়ে আবার উনি বললেন, "কত সাধ ছিল সেরে উঠবে। তাড়াতাড়ি আরাম হ'বার আশায় হাসপাতালে গিয়েছিল। শশুর বাড়ির শেষ চিহ্ন ননদটি ছিল আমার—তা-ও গেল। মা—রে!"

যে কথা জানতে উস্‌খুস্‌ করছিলাম, সে কথাটি কাল বিলম্ব না ক'রে তুলে ফেললাম।

"শুনছিলাম, ওঁর দেহ নাকি হাসপাতাল থেকে ছাড়ছে না? কেন? অপারেশনই বা কিসের হ'ল!"

"আর মা বোলনা। বিপদ কখনও একা আসেনা। গল্‌ব্ল্যাডারে হয়েছে অসুখ বলে অস্ত্র ক'রে দেখে কিছুই না। অযথা কাটাকাটিতে মেয়েটার প্রাণ গেল। এধারে নিজের বয়স লিখেছে একুশ। ওর ছেলের বয়সই তো আঠারো। কাঁচড়াপাড়ার কলে কাজ করে। খবর পেয়ে এল, হাসপাতালের লোকেরা তো দেখে অবাক। একুশ বছরের মায়ের আঠারো বছরের ছেলে হয় কি ক'রে? তাই এখন দৌড়োদৌড়ি চলছে, ওরা মড়া ছাড়তে চায়না।"

ছোট ক'রে ছাঁটা চুল, থান আর ভীতু-ভীতু ভাব! অথচ, বয়স একুশ?

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "বয়স এত কমিয়ে ওঁর লাভ কি হ'ল?

আধুনিক তরুণীরা ভবিষ্যতের আশায় অনেক সময় বয়স কমায়

বলেই জানতাম। পাড়াগেঁয়ে বিধবার আবার ও বালাই কেন?

পিসি বললেন, "কি ক'রে জানবো, মা? এধারে সাদাসিদে মানুষ দিব্যি। এমন দুর্মতি যে কেন হ'ল? ভাল হওয়ার বড় সাধ ছিল ওর।"

বয়স কমাবার চেষ্টা কেন এতক্ষণে বোঝা গেল। উনি নিজের সামনে ভবিষ্যৎ এখনও আছে, তাই দেখাতে চাইতেন। বয়স হয়ে গেছে ভাবতে বাজত। তাই বয়স কমিয়ে গায়ের জোরে তিনি নবীন জগতে স্থান চান। লোকটি বড় বোকা ছিলেন, বলতেই হ'বে।

বিমনা হয়ে বললাম, "কিন্তু, অস্ত্র করার তো দরকার ছিল না। আজকাল এরকম চিকিৎসা-বিভ্রাট হয় শুনেছি। ওঁর অসুখটা তো অম্বল।"

"তাইতো মা, তাইতো। কিন্তু ডাক্তারে তো বোঝেনি। এখানে এসে কি আর কাশি কমে, আরও উপসর্গ দেখা দিল।"

"এঁরা তো এমনি ক'রেই মরেন। আমাদের দেশের মেয়েরা। সময় থাকতে সাবধান হলেন না কিনা। খালি পেটে থাকলেই এসব ব্যারাম ধরে। যা হয় মুখে দিয়ে নিতে হয়। না হয় একমুঠো মুড়ি—"

পিসি এবার চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন—

আস্তে আস্তে বললেন, "মুড়িই কি সব সময়ে থাকে, মা?

আমার গালে কে যেন চড় বসিয়ে দিল।

কাঁদুনে গলায় পিসি বলে চললেন "ছেলে এখানে উদয় অস্ত খেটে ক'টি ক'রে টাকা পাঠাত। পেটভরে একবেলার খাওয়া জোটেনি, তায় মুড়ি চিড়ে! ধান কিনে ধান বেনে চাল করত। বেশি বেলায় রান্না ক'রে খেত, যাতে রাত্রে আবার ক্ষিদে না পায়। স্বামী থাকতেই অম্বল ধরেছিল। এমনধারা চালচলনে বেড়ে উঠল। দাদার হাতে-

পায়ে ধরে চিকিৎসা করাতে এনেছিলাম। আর ফিরল না ননদ আমার মারে—মা!"

পিসি আবার ডুকরে উঠলেন। আমি আর ওখানে এক মিনিটও দাঁড়াতে পারলাম না—তাড়াতাড়ি নিজের বাড়ি ফিরে এলাম। আমার এত দিনের জগৎ, সাধ-আহ্লাদ যেন খান্‌খান্ হয়ে পড়তে লাগল। নিজেকে নিয়ে ভাবনা-ঘেরা দিনগুলির তলায় বেজে উঠল অন্য জনের কথা, অন্য দিনের সুর।

সেই বসবার ঘর। মার্বেল নয়--সিমেন্ট। সেই বাড়ি—প্রাসাদ নয়, অসমাপ্ত ছোটখাটো আস্তানা। সেই গাড়ি—মিনার্ভা নয়, সস্তা পুরোনো ফোর্ড।

আজ কিন্তু তারা সবাই তর্জনী তুলে বলে উঠল—কত পেয়েছ জানোনা? খালি পেটে থাকলে যেমন অসুখ করে, বেশি খেলেও তো বদহজম হয়—অম্বল হয়ে ওঠে। ওর ঘরে মুড়ি থাকেনা—তুমি চাও মার্বেল! ওই রোগ তোমাকেও ধরল বলে। সাবধান!

শোক

মন্দিরার বাল্য-সখী মিতুল বড় বিপন্ন। মিতুলের ভাল নাম রমা। মন্দিরার সঙ্গে তার সখিত্ব কতটা প্রবল ও প্রকট, সমর্থনার্থ মিতুল নামটাই আমার এ গল্পে ব্যবহার করছি।

সাতপুরুষে কেরানী মন্দিরার বাবা মেয়ের ঐ নাম রেখেছিলেন নিজের কীর্তন প্রীতি হেতু নেহাত খঞ্জনি বা শ্রীখোল নাম না রাখতে পারায়। বাসরে তিনপুরুষে কেরানী স্বামী বৃকোদর সিউরে ওঠা

ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, "বলি, শান্তিনিকেতনে যাওয়া টাওয়া আছে না কি ?"

কেবলমাত্র নামে অসামান্যা মন্দিরার চিরকালের বন্ধু মিতুল। দু'জনের বাবা একই ফার্মে কলম পিষেছেন। দু'জনের মা লোহা-বাঁধানোর কোলে চারগাছি ক'রে মিছরী কাটা চুড়ি পরে পুরাতন বস্ত্রের বিনিময়ে একত্রে কন্যা-বিবাহের কাঁসার বাসন কিনে জমিয়েছেন। আগে পরে কাছাকাছি দু'জনে দুই কেরানীর গলায় মালা দিয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে।

পাশাপাশি বাড়িতে দু'জনে রয়েছে—সেটা সযত্ন সন্ধানের ফল মাত্র। একসঙ্গে একভাবে বাড়ি সাজানো, শাড়ি কেনা, গয়না গড়ানোর মধ্যে বন্ধুপ্রীতি ক্ষণে ক্ষণে উছলে পড়ে। সন্তানের জন্মের সময় এ ওকে সাহায্য করে। পরস্পরের চিত্তবিনোদ করে পতিনিন্দায়। শোকে সান্ত্বনা দিতে ছুটে আসে।

সম্প্রতি মিতুলের দিদি হাসপাতালে মরণাপন্ন। কিছুদিন হ'ল তাঁর ক্ষীণ ও বৃদ্ধ দেহে অস্ত্রাঘাত হয়েছে। ফল, ক্রমশঃ ক্ষয় ও মৃত্যুর সূচনা। মিতুলকে প্রত্যহ বাসে ছ' মাইল দূরে হাসপাতালে দেখতে যেতে হয়।

মাঝে মাঝে সঙ্গে যায় মন্দিরা। যদি নাও যায়, ক্ষণে ক্ষণে খবর নেয়। মিতুল যাবার আগে একবার এবাড়ি ছুটে এসে সে সখীর অনুপস্থিতিতে করণীয় কিছু আছে কিনা বুঝে নেয়। মিতুলের ছেলেমেয়ের খবরদারি করে। মিতুলের সঙ্গে মন্দিরারও কাজ জুটেছে।

এতে কিন্তু প্রীত মন্দিরা, বিব্রত নয়। কেবল সখীত্বই কারণ নয়। কিছুদিন পূর্বে উভয়ের বন্ধুমণ্ডলে কিঞ্চিত কালছায়া পড়েছিল। বিপদের

মুহূর্তে সরে যাচ্ছে সে ছায়া। বিয়োগব্যথার অশ্রুপ্লাবনে সে মেঘ সম্পূর্ণ নাস্তি হয়ে যাবে, এমন একটা আশা আছে মন্দিরার।

কারণ, কিছুদিন পূর্বে মন্দিরার আর্থিক উন্নতি মিতুলের সমান্তরাল জীবন থেকে হয়তো মন্দিরাকে একটু সরিয়ে ফেলেছে। বৃকোদর বাঁধা অফিসের কাজের বাইরে কয়েকটি অর্থ প্রচেষ্টায় রত হয়েছিল। চেষ্টায় ফল উদ্‌গম হয়েছে।

ঠিকে ঝি-এর বদলে এখন মন্দিরার কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ড ভৃত্য। এক সঙ্গে দুই বাড়ির জানলায় পুরনো শাড়ির পর্দা নাচানাচি ক'রত বাতাসে। মন্দিরার জানলায় এখন দুলছে শান্তিনিকেতনী পর্দা। আগে সস্তা শাড়ির সন্ধানে দু'জনে হন্যে হয়ে ফিরত। আহা কত সুখই না ছিল সে সব ব্যাকুল ভ্রমণে! এখন বড় দোকানে গিয়ে ভারি হাতব্যাগ খুলে শাড়ি কিনতে সক্ষম মন্দিরা।

সুতরাং ব্যবধান যে স্বাভাবিক বৈষম্যহেতু, একথা সত্য। একটু আধটু বেসুর বাজে।

চেতলার হাট বসেছে। আগেকার মত মিতুল ব্যগ্র হয়ে এল, "ভাই মন্দ, ওখানে বেশ ভাল কাঠের জিনিস ওঠে। চলনা দুপুরে খাওয়া সেরে যাই। বিকেলে চায়ের পাটের আগেই এসে পড়ব। একটা ব্র্যাকেট কেনবার ইচ্ছা আছে।"

মন্দিরা নবলব্ধ গৌরবে বলে ফেলেছিল, "যা, যা, চেতলার হাটে আবার কাঠের জিনিস! সস্তা প্যাকিং বাক্সের কাঠে কাঁচা রং লাগানো। ও আবার কিনে কেউ ঘর সাজায় নাকি?"

ফোঁস ক'রে নিশ্বাস ফেলে মিতুল ব'লে উঠেছিল, "হাঁ ভাই, আমাদের মত লোকে ঘর সাজায় বৈ কি। ভুলেই গিয়েছিলাম এখন তুমি বড়লোক হয়েছ। মাপ কোরো!"

কাঁচের বাসন সেই দিন চিড় খেয়ে ফেটে গিয়েছিল। অদ্যাপিও জোড়া লাগেনি।

তা, মন্দিরার বন্ধু সার্কেল এখন বেশ বর্ধনশীল। বৃকোদরের কর্মকালীন বন্ধুর স্ত্রীরা আসে। চা খায়, গল্প করে। কিন্তু ওই কালকেলো মেয়েটি, যার নাকের আগায় কপালে গোলা সিঁদুরের মস্ত ফোটা, হরতন খোঁপা বাঁধা তার মত গল্প কেউ করতে পারে না। ওই মিতুলটার সঙ্গে প্রাণের কথা বলে যে সুখ হয় তা কি এদের কাছে সম্ভব? বন্ধুত্ব ঝালাতে উঠে পড়ে লাগল মন্দিরা।

এর মধ্যে হঠাৎ মন্দিরার খুড়তুতো ভায়ের স্বর্গারোহণ পর্ব ঘটে গেল।

বিচিত্র নয় কিছু। ছেলেটি কিছুকাল পঙ্গু অবস্থায় ছিল, কবিয়ানা ক'রে বলা চলে, 'মৃত্যুর প্রহর গণা' আর কি। সে স্বর্গস্থ হয়ে আত্মীয়জনের প্রাণে শান্তিই দিয়েছে। তবু, শোক তো? বাচ্চা মেয়েকে দিয়ে পাশের বাড়ি খবর পাঠিয়ে মন্দিরা কাঁদতে বসল। এইবার মিতুল আগের মত কাছে সরে আসবে।

মিতুল এলও, সান্ত্বনা প্রদানও হ'ল। তবু, জমল কই শোকের পালাগান? মন্দিরার দেয়ালে সস্তা হাত আয়নার স্থানে চক চকে প্রকাণ্ড নতুন আয়না ঝুলছে, মশারী সবুজ জাল নয়, শাদা নেটের। চোখ মেলে মিতুল দেখে নিল। একসঙ্গে কেনা হয়েছিল চাঁদনী চকের মশারী। মিতুলের ঘরে এখনও ঝুলছে। অথচ? মিতুলের সহানুভূতির গলা জমে গেল, হাত শক্ত হয়ে উঠল মন্দিরার পিঠে সান্ত্বনার বিলেপনে। এটা আপনি গেল, মৃত্যু সুযোগ দিল না বন্ধুত্বের নিবিড়তার।

কিন্তু এবার যে বিপদ মিতুলের—মিতুল এবার গলে গেছে।

মন্দিরা এবারকার সুযোগে পুরনো বন্ধুকে ফিরে পাবে অবশ্য।

মন্দিরা মহাসমারোহে আয়োজনে নেমে গেল। সেই শেষের যে ভয়ঙ্কর দিনে রোরুদ্যমানা মিতুলকে কি বলে সান্ত্বনা দেওয়া যেতে পারে, মনে মনে তার কিছু রিহার্সেল চলত—"তা ভাই মিতুল, কেঁদে কি করবি, বল ? আত্মীয়-স্বজন কি থাকে ভাই ? এইতো সেদিন আমার অমন রবীনদা দেখলি তো ভাই, কেমন ক'রে চলে গেল।" চোখে ঝরবে জল, গলায় ঝরবে মধু। মিতুল-মন্দিরার মিলন হবে। কি স্বর্গীয় দৃশ্যটি !

কয়েকদিন ধরে মন্দিরা এটা ওটা যোগাড় করছে। মিতুলের দিদির ঘড়িতে বারোটা বেজে গেছে নিঃসন্দেহে। এখন হাড় ক'খানা চিতেয় ওঠার বাকি মাত্র। সেদিন থেকে কয়েকটি দিন ধরে যত্ন আদর দিয়ে মিতুলের পরিবারকে ঢেকে রাখতে হবে তো মন্দিরার।

পাশের বাড়ির খোকা ডেকে দিল, "মাসীমা, মা এসেছে।"

বিনা আগমনীতে শারদীয়া। খপ্ ক'রে মন্দিরা লাফিয়ে উঠে ঘরের বাইরে এল। না, মিতুলই এসেছে। দেখেই বোঝা গেল হাসপাতালের জরুরী ডাক।

মন্দিরা সাগ্রহে প্রশ্ন করল, "কি খবর এল ? যাচ্ছিস বুঝি ?"

ভাঙা গলায় মিতুল বলে উঠল, "ভাই, দিদি এতক্ষণে আছে কি না কে জানে। তোর ভরসায় সব ছেড়ে যাচ্ছি, মন্দ। রান্নাবান্নাও করতে পারিনি। উনি অফিস থেকে ফিরলে বলে দিস্। এখন গিয়ে দেখি, কি না দেখি !"

কেঁদে ফেলল মিতুল ঝরঝর ক'রে।

"আহা, আহা ! কাঁদিস নি। দেখবি বই কি"—ওকে জড়িয়ে ধরল মন্দিরা। সেই পুরনো মিতুল।

মিতুল হাসপাতালে চলে যাবার পরে দশভূজা হয়ে মন্দিরা কাজে লাগল। ঘরে সুজি আনিয়ে জমা করা ছিল। মোহনভোগা ক'রে নিজের হাতে ঢেকে রেখে লুচি ভাজতে চাকরকে বসিয়ে দিল মন্দিরা। এক্ষুণি পাশের বাড়ি খাবার নিয়ে যেতে হবে।

অফিস ফেরৎ বৃকোদর বাড়ি ফিরে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হ'ল। অবস্থা ফেরবার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী বেহাত হয়ে যাওয়ার ভয়ে মরি বাঁচি ক'রে পাট ভাঙ্গা কাপড়ে মন্দিরা অফিস ফেরতের কাছে হাজিরা দিত। আজ তার রান্নাঘরের টিপিক্যাল্ মূর্তি। গলা তুলে, মন্দিরা ডাকল, "ওগো শুনছ, একটা কাজ যে করতে হবে।"

"এখন আবার কি কাজ ? সবে তো কাজ থেকেই ফিরছি।"

"মানে পাড়ার রেশন দোকানে তুমি নিজে একটু বললেই হবে। কিছু আতপ চাল দরকার।"

"এখন আবার আতপ চাল কেন ?"

"হবিষ্যিতে তো আতপই লাগে!"

বৃকোদর চাষাড়ে রসিকতায় দক্ষ। অত্যন্ত শিউরে-ওঠা ভঙ্গিতে বলল, "বলি, বিধবা হয়েছ নাকি ?"

"কথার ছিরি শোন! মাগো মা! মিতুল যে কাঁদতে কাঁদতে হাসপাতালে গেল।"

"দিদি টেঁসে গেছে বুঝি ?"

"এতক্ষণে কি আর তা যায়নি ?" মন্দিরার স্বরে প্রীতি—,

"তাই বলছি, আহা বেচারী ফিরে এলেই যেন তৈরি ভাত পায়।"

"বোনের মরায় আবার হবিষ্যি করে কে ? যত সব!"—বৃকোদর পা বাড়াল ঘরের দিকে।

"মানে, মিতুল একটু পিট্‌পিটে তো। হয়তো আজ হবিষ্যি করতে

চাইবে, দরকার না হলেও। যাও না গো, আমার চা করতে করতে যাবে আর আসবে। এই তো মোড়ের দোকান।"

ইচ্ছা ছিল না বৃকোদরের, কিন্তু স্ত্রীর চখে যুগপৎ রোষ ও মিনতি। সম্মুখে আসন্ন নিশীথ-শয়ন। স্থতরাং বাধ্য হয়ে বৃকোদর পথে নামল, গা ছুলিয়ে অশ্লীল ভঙ্গিতে, 'সইলো, সই', আওড়াতে আওড়াতে।

মন্দিরা পাশের উনুনের আলুর দম নামিয়ে পটল ভাজা চড়িয়ে দিল। শোকের মুখে খেতে ইচ্ছা করে কি কারুর? তবু দশ রকম সাজিয়ে দিলে বেছেটেছে নেওয়া যায়। ভাগ্যি সাবুর পাঁপরগুলো সব খরচ করা হয়নি। মিতুল হয়তো খেতে চাইবে না ভাজাভুজি। তবু ওর স্বামী, ওর ছেলেপিলেকে দিলে ও খুশিই হবে দেখে। মিছরি জমিয়ে রেখেছে মন্দিরা এই উদ্দেশে,—হুধ জ্বাল দিয়ে দেবে মিছরি দিয়ে। গভীর শোক মিতুলের!

মিতুলের স্বামী ফিরছেন কি না দেখবার জন্য খোকনকে সেন্‌ট্রি বসানো হয়েছে। সেদিকে চোখ কান খোলা আছে মন্দিরার। ব্যস্ত-ভাবে ঘরবার করবার মধ্যে মধ্যে পালাগানের টুকরো অংশের মত বাজছে অদূর ভবিষ্যতে নিজের শোকজ্ঞাপনের প্রণালী—

"ভাই মিতুল, লক্ষ্মীটি, কাঁদিসনি। দিদির বয়স হয়েছিল, ভালই গেছেন। এ কি চিরদিন থাকবার জিনিস রে? দেখনা, রবীনদা কেমন ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।"

"মিতুল লক্ষ্মীটি, চোখ মোছ। দিদি গেছেন—আমি তো রয়েছি তোর। ভেবে দেখ, ছেলেবেলা থেকে আমাদের এক মন, এক প্রাণ। পৃথিবীতে কিছুই থাকে না, মিতুল। তুই তো সরে যেতে গিয়েছিলি, ভাই। ক'টা দিন কি বন্ধুদের মধ্যে মন-কষাকষি ভাল, না? আমি তো চিরকাল এক মনেই আছি।"

সত্যি, মিতুলের জীবনযাত্রা থেকে এতটা প্রভেদ সৃষ্টি না করলেই হত রাতারাতি। রয়ে সয়ে আসবাব কেনা, গয়না গড়ানো উচিত ছিল। নিজের মনিবন্ধ দেখল মন্দিরা। ছ'গাছা চুড়ি, কঙ্কন, সোনা মোড়া শাঁখা ও লোহা। মিতুলের মিন্‌মিনে চুড়ি ক'গাছা মাত্র সম্বল। এই হাতে কি মিতুলের চোখের জল মোছানো সাজে? কঙ্কনজোড়া ও ছু'গাছা ক'রে চুড়ি মন্দিরা হিঁচড়ে খুলে সগুক্রীত লোহার আল-মারীতে তুলে রাখল।

সত্যিই তো, মিতুলের মন খারাপ হয়ে যায় না? আচ্ছা, বৃকোদরকে বলে যদি মিতুলের স্বামীকে ব্যবসাতে নামান যায়? তা-হলে তো মিতুলের অবস্থাও তারই মত ফিরে যাবে। তাহ'লে তো, বন্ধুত্ব নতুন ক'রে আরও জমবে। দেখা যাক।

বৃকোদর ফিরে এসেছে—"শালার কণ্ট্রোলে নাকি আতপ চাল নেই? বলি বিধবা হ'লে মেয়েছেলেরা করে কি? ধর, আজ তোমারই যদি একটা হয়-নয় হয়ে যায়—" মন্দিরার কোমল পাণি মুখে চাপা দিল বৃকোদরের। চুপ ক'রে খেতে বসল সে।

"বলি, রাজস্যূয়র কন্না যে ক'রে তুলেছ, হ্যা! সখীর দিদি মরলে তোমার ঘটাপটা কেন, হ্যা? সবই বাড়াবাড়ি। প্রতিবেশী বন্ধু, যেটুকু না করলে নয়—"

স্বামীর ওপর চটে গেল মন্দিরা, "তুমিতো বলবেই। মিতুলের যে কেমন লাগছে!"

"বলি, ধরেই নিয়েছ যে দিদি টেঁসে গেছে। ধর যদি না যায়, এত যোগাড় তোমার যে মাঠে মারা যাবে। তার চেয়ে দাও আমাকে ধরে। আমিই মেরে দি। বাপ-মা সাধে আমার নাম রেখেছিল। হা, হা।" বৃকোদর হেসে উঠল গলা ছেড়ে।

"চুপ, চুপ। মিতুলের এমনি হয়ে গেল, আর তুমি গলা ডাকিয়ে হাসছ? ধিক, ধিক! ওরা শুনলে কি ভাববে?"

"বাড়িতে কেউ আছে না কি?"

"খোকনকে বসিয়ে রেখেছি। ছেলেমেয়েদের সব এ বাড়িতে আনিয়েছি, দেখেছই তো। মিতুলের স্বামী এলে আমি খাবার পত্তর নিয়ে যাব। তারপর মিতুল ফিরলে তো কাজের ঠ্যালায় চোখে-কানে দেখা যাবে না।" মন্দিরার মুখ আনন্দে ঝলমল। আশায় আনন্দে দেহমনে উৎসবের সমারোহ। ভবিষ্যতে যেন প্রত্যাশা আছে শোকের নয়—অপূর্ব কোন অভিজ্ঞতার। সেই অভিজ্ঞতার বন্ধনে দুইটি মন আবার এক হবে। আজ মন্দিরার কি শুভদিন! মিতুলের শোকের মধ্যে নিহিত আছে মন্দিরার আশ্বাস। আজ আর মন্দিরাকে মিতুল দূরে সরিয়ে রাখবে না।

পাশের বাড়ি কলরোল জাগল। মিতুলের স্বামী ফিরেছেন বুঝি? প্রদীপ্ত মুখে ছায়া টেনে বারান্দায় এল মন্দিরা। এযে মিতুল। তা-হ'লে শ্মশানে যায়নি ও?

মন্দিরার নীরব প্রশ্নের সরব উত্তর এল, "না ভাই মন্দ। বরাত ভাল। দিদিকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে। তাই ওরা রামজী-চাকরকে পাঠিয়েছিল আমাকে ডেকে নিয়ে যেতে। খোট্টাই ভূতের কাণ্ডটাই অমনি। কিছু কি বলতে পেরেছে? আমি ভয়ে সারা রাস্তা কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে শুনি, দিদি এযাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলেন।"

মন্দিরার মূঢ়-স্তম্ভিত দৃষ্টির সামনে মুখ ফিরিয়ে অবলীলাক্রমে বাড়ি ঢুকল মিতুল। "ছেলেমেয়েগুলোকে পাঠিয়ে দাও। অনেকক্ষণ দেখি নি।"

সেই দূরে—সরে যাওয়া মিতুল।

সারা ঘরে খাবার সাজানো—মিছরী দিয়ে জ্বাল দুধ। মন্দিরার আশ্বাস, অপূর্ব অভিজ্ঞতার প্রত্যাশা খান্‌খান্‌ হয়ে খাবারের চারপাশে ঝরে পড়ল।

শোকের সমারোহ দৈনন্দিন জীবনে তো ব্যতিক্রম এনে দিল না।

একটি মহতী মৃত্যু

বাঁধানো একখানা খাতা।

জন্মদিনে উপহার পেয়েছিল পুণ্ডরীক, সোনার জলে বাঁধানো মলাটে তার নামটি লেখা, পুণ্ডরীকাক্ষ মিশ্র।

পিতা কেরানী হ'লেও তাঁর মনে উচ্চাশা ছিল পুত্রের সম্পর্কে। তিনি শৈশব থেকে পুত্রের একটি উচ্চ জীবন কামনা করতেন।

অনেক পুত্রকন্যার জনক হ'লেও বড় ছেলের উপর আস্থা ছিল অধিক। বিশেষতঃ সে পড়াশোনায় ভাল ছিল।

রোগা মেয়েলী চেহারার ছেলে, ফর্সা রং-এ রক্তের অভাব। ঝাউ গাছের তলায়, কাশঝোপের ধারে বসে দিনরাত্রি বই পড়ায় একমাত্র আনন্দ ছিল তার।

লাজুক-স্বভাব, প্রাণহীন, অতএব মাতার প্রিয় হ'ল সে। মা অজস্র কাজকর্ম এবং সন্তানভারে পীড়িতা হ'লেও চোখ থাকতো সর্বদা ছেলের দিকে।

সে চেয়ে খেতে জানে না। তাই একবারেই পর্যাপ্ত আহার তাকে দিতে হ'বে।

সে ভালবাসে চিংড়ির মালাই কারি, মা মেয়েকে নারকেল পাড়াতে

ছোটান চিংড়ি মাছ এলেই।

পাশের বাড়ির ছেলের খয়েরী ডুরি-টানা শার্ট পুণ্ডরীক বার কয়েক চেয়ে দেখেছিল। অতএব পূজার সময়ে ওই কাপড়ের জামা দাও তাকে।

সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরেই যাতে আলো পায়, মা ঠাকুরঘরে প্রদীপ দেবার আগেই বড় লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে ওর ঘরে রেখে আসেন। বাখারি বেড়া দিয়ে একফালি ঘর তাকে আলাদা দেওয়া হয়েছিল, ম্যাট্রিক পাশের পড়ার সুবিধার জন্য।

বাবা ছেলেকে নিয়ে প্রকাশ্যে, নাচানাচি করতেন না, বরঞ্চ মায়ের মমতায় সময়ে সময়ে বিরক্ত হতেন। কিন্তু মনের গোপন কোণে ছিল তাঁর বাসনা, তাঁর ছেলে দশের এক হয়।

প্রত্যেকবার গেঁয়ো স্কুলে প্রথম হয় ছেলে। তিনি ছাত্রবৃত্তি পাশ ক'রে কিছুদিন টোলে পড়েছিলেন মাত্র। তারপর স্থানীয় জমিদারের কর্মচারী হ'লেন। বাঁধা মাহিনা যৎসামান্য হ'লেও আয়ের সুলভ উপায় গ্রহণ করতে তিনি বিরত হন নি, পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে মুগ্ধবোধম্ পড়া সত্বেও। তাঁর মত আধা-মূর্খ লোকের ছেলে প্রাইজ হাতে বাড়ি ফেরে। বৎসরের শেষে স্কুলে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে রূপামোড়া দস্তার মেডেল গলায় ঝোলায়। একবার হাকিম সাহেব ওর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক পর্যন্ত করেছিলেন।

ছাতার বাঁটে ভর রেখে তিনি দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখার পরেই মনে ভাবান্তর হ'ল। বিশিষ্ট লোকেদের নির্ধারিত আসনে অবাঞ্ছিত অভি-বাদকের স্থান হয়নি। দণ্ডায়মান অবস্থায় তিনি এবম্বিধ দৃশ্য অব-লোকন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মোন্মাদের মত মনে উদয় হ'ল তাঁর, এ ছেলে সামান্য নয়।

ছেলেকে ঘিরে স্বপ্ন দেখা আরম্ভ হ'ল তাঁর। কিন্তু কি ভাবে স্বপ্ন সফল হ'বে, কোন পথে, বুঝলেন না তিনি। ছেলেকে বিশেষ চোখে দেখা, শাসন বাদ দেওয়া, এছাড়া কি করণীয় বুঝলেন না।

ছেলেও নিজের মহিমা উপলব্ধি ক'রে হয়ে উঠল গম্ভীর, রাশভারী। ভাইবোনদের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল না, এখন তাদের সঙ্গে এক বাড়ি থাকা ভিন্ন তুচ্ছতম যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। শুধু মায়ের দিকে আরও ভেসে এল সে। সাংসারিক জ্ঞানবুদ্ধি যথেষ্ট ছিল না, মা হ'লেন ওর আশ্রয়।

বাখারি বেড়াবাঁধা আধখানা ঘরে কেরোসিন কাঠের টেবলে ঝুঁকে পড়ে দিনরাত্রি পড়তে লাগল পাঠ্য বই, বাইরের বই। পরীক্ষায় নাম শীর্ষে রেখে চলাটাই ওর পক্ষে আপাততঃ নিজের মহিমা প্রকটের এক-মাত্র উপায়।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন মা বললেন ওর বাবার কাছে, "ওগো জান, রিকু কবিতা লিখেছে।"

রাত্রি তখন গভীর হয়েছে। সবে সন্তানের পাল ঘুমিয়ে পড়েছে। লণ্ঠন নিভে গেছে। একটু দেহধর্মের চর্চার উদ্দেশে ব্যগ্র হয়েছিলেন পিতা। কিন্তু চমকপ্রদ সংবাদটি শুনে স্ত্রীর শীর্ণ দেহ থেকে নিজের অক্টোপাস ভূজবন্ধন সরিয়ে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "বল কি ?"

"রোদে পিঠ রেখে একখানা চোতা কাগজে পেন্সিলে লিখেছে।"

অভিভূত ভাব দমন ক'রে বাবা অতিকষ্টে বললেন, "কি বিষয়ে লিখল ?"

"ঝাউগাছ নিয়ে লিখেছে। পড়লেই চোখে জল আসে।"

"ঝাউগাছের কবিতা পড়ে চোখে জল আসবার কি আছে ?"

"এই লিখেছে, ঝাউগাছ কত সুখী, ও সুখী নয়—এই সব।"

পিতা দেহচর্চা ভুলে অধোবদনে বসে রইলেন। একটা গাছ সুখী ন্যাড়া আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে, আর দুধ ঘি খেয়ে আরামে থেকে মানুষ সুখী নয়, এমন তথ্য ওঁর মনে আলোড়ন জাগাল। একটু ভেবে-চিন্তে নিয়ে বললেন, "মন্দ কি ? গভর্ণমেণ্ট জমিদারী নিয়েছে, ইন্‌-কাম্‌ ট্যাক্‌সের ঠেলায় বড়লোক থাকতে দিচ্ছে না কাউকে। কবি হ'লে নামধাম হবে। রবি ঠাকুরের মত কবি। এই তো, সাহিত্যিকরা সভা করতে এলে কি সম্মান পান, দেখি তো। জমিদারবাবুরা হেঁট-মুখে থাকেন ওঁদের সামনে।"

সেই সমস্ত সুখী ঝাউগাছের নীচে একদিন বাবা ছেলের হাতে খাতাখানি দিলেন।

জন্মতিথির উৎসব হয় না, হবার অবস্থা নয়। পাড়াগাঁয়ে বহু সন্তান প্রসবিনী মা তবু গুড় দিয়ে সেদিন পায়েস রান্না করেন, হাট থেকে বড় মাছ আনান।

মুগ্ধবোধের পরে পিতা ভট্টিকাব্যের কিঞ্চিৎ রসাস্বাদ করেছিলেন। তাই মাথা খাটিয়ে বার করলেন খাতার বুদ্ধি। বাবুর বাড়ির ছেলেদের খাতার মত সোনার জলে নামও লেখা হ'ল।

পাড়াগাঁয়ের পক্ষে দুর্লভ উপহার।

অবাক পুণ্ডরীক চেয়ে রইল। আকাশ দিয়ে বাজপাখি একটা চিৎকার করতে করতে ভ্রমণ করছিল। সেই আকাশের দিকে তাকাল। ঝাউপাতা পায়ের নীচে সবুজ ঘাসের আস্তরণ। বুঝে নিল পুণ্ডরীক, তাকে প্রকাণ্ড বড় কিছু করতে হবে।

তারপর, দিন রাত্রি পাশের পড়া এবং ফার্ষ্ট হওয়ার চিন্তার মধ্যে জেগে উঠল আর এক চিন্তা। কবি হবার সাধনা। কৃষ্ণচূড়ার গাছের

লাল ফুল, সুপারির দোলন, ঝরে-পড়া লাল বটফল তার মনে কাব্যের প্রেরণা এনে দিত।

বর্ষার গাঢ় মেঘমেদুর প্রকৃতি, দূর বিল থেকে ভেজা বাতাস হু-হু ক'রে বয়ে আসছে। বাখারির বেড়ার ফাঁকে বাতাসের উঁকি লণ্ঠনের ভীরু শিখাটিতে কম্পন আনতো। কেরোসিন কাঠের টেবলে ঝুঁকে পড়ে লিখে যেত সে ছোট ছোট অক্ষরে একের পর এক কবিতা।

রাত্রি জাগরণের স্বাদে ভরপূর সেই কাব্যলেখা। কিন্তু বাঁধানো খাতায় এদের স্থান হ'ত না। খাতার যোগ্য বলে তাদের মনে করত না পুণ্ডরীক। বাবা অনাদিপ্রসাদ মিশ্র প্রথম পুত্রের নামকরণ করেছিলেন টোলে পড়া বিদ্যা ঝেড়ে। পুণ্ডরীক অন্যরকম হোক। পিতার আশা পূর্ণ করতে হবে ওর।

এক-আধটি কবিতা লোকের চোখে পড়তে লাগল। স্কুলে চারণকবির সম্মানও পেল সে।

কিন্তু সুপারি-ঝাউঘেরা দীঘির ধারের জগৎ কতটুকু আর সম্মান ওকে দিতে পারে?

বাইরের জগতে হাত বাড়াল ও। সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা খেল। একটি কবিতা তার কলিকাতার কোন কাগজে পাদপূরণে ছাপা হ'ল। উৎসাহ বর্ধিত হওয়াতে ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকার ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে কবিতা পাঠাতে লাগল। কিন্তু পরিণাম নিরাশা।

কোথাও স্থান তারা পেল না, সম্পাদকের কাগজ-ফেলা ঝুড়ি ছাড়া। ডাকটিকেট দেওয়াতে কয়েকটি ফেরত এল।

একবার ছাড়পত্র পাওয়াতে তার কতকটা গৌরব বেড়ে গিয়েছিল। ফেরত লেখাগুলো ধরে বারবার পড়তো ও।

বাঁশবনের ধারে, বাড়ির ডোবাটির পাড়ে লম্বা ঘাসের ঝোপে বসে

পুণ্ডরীক পড়তো নিজের রচনা, আর ভাবতো। শরতের কমলালেবু রংয়ের রোদ। হেমন্তের শিশিরে ভেজা ধানক্ষেত, কাঁঠালিচাঁপার ঘ্রাণমদির সন্ধ্যা, খয়েরী শালিকের পাখার ঝট্‌পট্‌—সব দিয়ে গেঁথে তোলা কবিতা তার, অন্যের কাছে কেন আদর পেল না ?

বাঁধানো খাতাখানির নতুন সম্ভাবনা মনে উদয় হ'ল ওর।

খাতায় ধরে ধরে সে লিখল নিজের কবিতা নানা নামের আড়ালে। মধ্যে গল্প, প্রবন্ধ কিছু বসিয়ে দিল। যেন একখানা মাসিক পত্র।

বাইরের পত্রিকা না-ই বা চাইলো, তার নিজের প্রকাশ ক্ষমতায় বাধা দেবে কে ?

এই তার প্রথম পত্রিকা প্রকাশ।

হাতে লেখা।

কিছুদিন চললো স্বপ্ন বয়ন ক'রে। পত্রিকার কল্যাণে গদ্যরচনায়ও মনোযোগী হ'তে হ'ল। ফলে বাংলা পরীক্ষায় উৎকর্ষ লাভ করল।

যথাকালে স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ ক'রে কলেজে ভর্তি হ'ল সে। মহকুমা শহরের কলেজ কয়েক মাইল দূরে মাত্র।

ইতিমধ্যে বাঁধানো খাতাখানা ভ'রে এসেছিল। কিন্তু নেশা ছোটেনি। ঠিক ও-রকম না হ'লেও অন্য খাতার যোগাড় ক'রে হাতে লেখা পত্রিকাটি নিজেই চালিয়ে যাচ্ছিল সে বছরে একটা দুটো। নিকট বন্ধুজন সন্ধান রাখতো, মা-বাবা সস্নেহে হাসতেন।

গৌরবে স্ফীত হ'ত সে।

কলেজে দিগন্ত বিস্তৃততর প্রসারে খুলে গেল। কলেজের ছাপানো ম্যাগাজিন ছিল। পুণ্ডরীক মিশ্র হ'ল সম্পাদক। পত্রিকা প্রকাশের খেয়াল কিছুটা মিটলো ওর।

তারপরে কবিতার পাঠকও জুটে গেল, মহকুমা শহরে।

কিন্তু কবিতায় সুর লাগে না কেন? লেখে সে রোদে পিঠ রেখে ঝাউতলায় বসে, অথবা কোমর নিমর্জন করা লম্বা সতেজ ঘাসের বনে বসে। নীল আকাশে শাদা বকের পাঁতি উড়ে চলে, গাংচিল পাখা মেলে, ধানের ক্ষেতের ডগায় রোদ নিভে আসে, কিন্তু কবিতায় রং জাগে না।

কি হ'ল? কি হ'ল আমার?

এমন পরিস্থিতি হঠাৎ গভীর শোক বয়ে আনলো। অধিক সন্তানজন্মক্লিষ্টা জননী তাঁর আদরের 'রিকুকে' ফেলে নয়ন মুদ্রিত করলেন।

সমস্ত দিনগুলো খালি হয়ে গেল। মায়ের পদধ্বনি আর প্রহরে প্রহরে বাজলো না। সকালে সদ্য সেঁকা রুটী, বিকেলে একবাটি দুধ বহন ক'রে বাখারির বেড়ার আড়াল থেকে সেই পদধ্বনি আসতো না তার দ্বারে। একটি আশ্রয় ছিল তার—ভেঙ্গে গেল।

আই. এ. পরীক্ষার পড়া ভুলে গেল সে।

সংসার চলে না আত্মীয়-স্বজন পাড়াপড়শীর দয়ায়। বাবা একদিন বিয়ে ক'রে ফেললেন।

গ্যাসের আলোয় নবোঢ়ার শ্যামাভ মুখখানা দেখে সর্ব দেহমন জ্বলে উঠল। খালি দিন বিদ্বেষে ভরে গেল। বাবার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণায় শামুকের মত খোলার মধ্যে গুটিয়ে গেল সে।

ফ্যাকাশে রং আরও একটু ম্লান হ'ল। চোখের নীচে কালির ছায়া, চোয়ালের হাড় উঁচু।

কোন মতে পরীক্ষা দিয়ে পাশ ক'রে বি. এ. পড়লো। এই সময়ে কবিতার জন্ম।

পড়ন্ত বেলার অলসক্ষণে বাঁশঝাড়ের একটা তল্‌তা বাঁশের ছিপ কাটছিল সে। মৌমাছির অবিশ্রাম গুন্‌গুন্‌, অশথপাতার ঝিলিমিলি —মনের কোণ থেকে মাথা তুলে দাঁড়াল—কবিতা।

হাত-দাখানা বাঁশপাতার মধ্যে ফেলে ছুটে এল ঘরের কেরোসিন-কাঠের টেবলে। হিংস্র আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল খাতার উপর। গভীর উন্মাদনায় স্নান-করা ব্যাকুল কবিতা তার বুকে বন্যার স্রোতে ভেঙে পড়েছে।

তারপর মধুর দিনগুলো।

কলিকাতার কাগজ এবার প্রত্যাখান করলো না ওকে। সাগ্রহে ওর কবিতা চেয়ে নিল। সাধারণ্যে পরিচিত হ'ল পুণ্ডরীক মিশ্র।

মাতার বিরহ ওকে কবিতা দিয়ে গেল।

বি. এ. পাশ করার পরে চলে এল কলিকাতায়। বাবার সঙ্গ, সৎ-মায়ের রান্না সহ্য হচ্ছিল না ওর। মায়ের অন্তর্ধান মেনে নিয়েছিল, কিন্তু অন্যের দ্বারা স্থানপূরণ কেন?

কলিকাতায় তরুণ কবির তখন নাম হয়েছে, বন্ধু জুটেছে। অনুরাগী ভক্ত এসেছে। তাদের ভরসা আছে।

সকলের চেয়ে বড় কথা—একটি পত্রিকা প্রকাশ করা। প্রচ্ছদপটে নাম থাকবে তার। আগে সে যেমন দ্বারে দ্বারে ঘুরেছে, তেমনি তার দ্বারে ঘুরবে সকলে। সে শুধু কবি নয়, কবির দল গঠন করবে সে।

পত্রপত্রিকা একটা শক্তি।

কলিকাতায় তাকে দেখবার জন্য উৎসুক ব্যক্তি ছিল বহু। তাদের সহায়তায় কবিপদে প্রতিষ্ঠিত হ'ল সে। সভাসমিতির মাল্যও গলায় উঠল। সংবাদপত্রের অফিসে একটা মাঝারিগোছ চাক্‌রিও পেল।

বি. এ. পরীক্ষার ফল মন্দ হয়নি।

আত্মপ্রসন্ন প্রীত ও গর্বিত পুণ্ডরীক মিশ্র। পত্রিকাও একখানা প্রকাশ করা হ'ল। বন্ধু বান্ধবের চাঁদায় চলে কাগজ। পুণ্ডরীক অবৈতনিক সম্পাদক।

পুনর্বিবাহের জন্য বাবাকে ঘৃণা করলেও নিজের মহিমা পত্রযোগে জানাতে ভোলেনি সে। বাবার আশা যে বহু ভাবে পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে, এ কথা জানাতে সে ভুলল না।

বাবা তাকে ঠকিয়েছেন দ্বিতীয় বিবাহ দ্বারা, কিন্তু বাবার প্রত্যাশা সে পূর্ণ করেছে!

দেখা হ'ল নীরজার সঙ্গে এক বন্ধুর বাড়ি ঝল্‌মলে পার্টিতে।

ঝল্‌মলে মেয়ে নীরজা—দেখে পদ্ম ফুলের কথা মনে হয়। দূর সেই গ্রামে দীঘির জলের একটি পদ্ম।

কাল চুলে পদ্মকুঁড়ি গোঁজা, শাদা শাড়ি-জামা। একহাতে গুরুভার রূপার কঙ্কণ, কানে রূপার ফুলঝুম্‌কা। পদ্মের মত চোখ তুলে বলল, "আপনিই কবি পুণ্ডরীক মিশ্র? আমার কি সৌভাগ্য!"

শূন্য মন যেন সুধায় স্নান ক'রে উঠল। মাতৃবিরহজনিত শূন্যতা পূর্ণ হ'ল এতদিনে।

বেশি বেগ পেতে হ'ল না। অর্থে দরিদ্র হ'লেও খ্যাতি ছিল বাহন। পিতৃগৃহের অমতে নীরজা বিবাহ ক'রে ভাড়া ফ্ল্যাটে চলে এল।

তারপরে আনন্দ, আনন্দ! জীবনে কি এতও সুখ আছে? আমের গায়ে রং ধরলে, গাছের পাতার আড়ালে বাতাবীলেবুর দেখা পেলে শৈশবে মনে যে হঠাৎ পুলক আসতো, এ আনন্দের স্বাদ ভিন্ন।

হেমন্ত বেলাশেষে শ্রান্তিভরা পরিপূর্ণতা, বসন্ত সকালের পাখ-পাখালির ডাক, দীঘির গভীর প্রশান্তি—প্রকৃতির যত মাধুর্য মুগ্ধ

করেছে পুণ্ডরীককে, তারা রূপ পেলে নীরজার মধ্যে।

নীরজা কবিতা হয়ে উঠল।

এধারে অসন্তোষ বন্ধুমহলে, ভক্তবৃন্তে, লেখাগুলো জমে না কেন পুণ্ডরীকের? জলো-পান্‌সে কবিতা, অসমাপ্ত রচনা তার কাছে কেউ আশা করেনি।

কাগজের চাহিদা কমে গেল। নীরজার প্রেমে আত্মবিস্মৃত কিন্তু ছাড়েনি পত্রিকাটিকে। ধার ক'রে কাগজ চালাতে লাগলো কোনমতে।

এধারে সংসার বৃদ্ধি হ'ল, আয় না বৃদ্ধি পেলেও। পদ্মকুঁড়ির মত চোখ তুলে কেমন দৃষ্টিতে নীরজা তাকায়। আশা করে স্বামী নতুন প্রতিভায় উজ্জীবিত হয়ে উঠবে। অভাব ঘুচে যাবে। স্বজন-বন্ধু গরীবের গলায় মালা দিয়েছে বলে অনুকম্পা প্রদর্শনে ব্যগ্র হবে না।

মিলের মোটা শাড়ি পরার অভ্যাস নেই নীরজার। রান্নাঘর ভাল লাগে না তার।

যুদ্ধ বেধে গেল। অভাব, অভিযোগ, অনটন। পথে যেতে যেতে মনে হ'ত শ্রান্ত পুণ্ডরীকের দেশের কথা। অভিমানে সে বাবার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি। কিন্তু এখনও সারা মন ভ'রে আনাগোনা চলছে সেই দিনগুলোর।

রুক্ষ-ক্লান্ত দেহে চন্দনবনের বাতাস বয়ে আনে সেই খড়ের ঘরের স্মৃতি। বাখারির বেড়ার পাশে নিত্য কবিতার স্বপ্ন। ট্রামে-বাসে ঝুলতে ঝুলতে ফেরে সে, মনে জাগে মায়ের হাতের তালপাখার ব্যজনের সঙ্গে সোনা-বাঁধা শাঁখার আন্দোলন। কাঁকরে ভর্তি চাল, মসুরের ডাল-খাওয়া মুখে স্বাদ আসে নবান্নের দুধ-নারকেল-গুড় মাখা চালের সুস্বাদ।

একদিন লক্ষ্য করল, নীরাজা যেন নিজেকে সামলে নিয়েছে। অর্থকষ্টে খিট্‌খিটে হয়ে গিয়েছিল, এখন দিব্যি হাসিখুশী। সাজ-পোশাকেও আবার মন দিয়েছে।

শাড়ির পাড়টা ধরে বলে, "এত দামী শাড়ি! আগে দেখিনি। কিনলে না কি?"

হেসে ওঠে নীরজা, "দূর বোকা! বিয়ের সময়ে ছিল। ভাবলাম পরে ফেলি।"

হাতের বালা নেড়ে বলে, "বালার সোনা পেলে কি ক'রে?"

"এতো কেমিক্যাল সোনা।" উত্তর দেয় নীরজা।

খুশী হ'ত সে। নীরজা বুঝেছে অসন্তোষে ফল নেই। সেদিন ভরা দুপুরে ফিরলো সে। নীরজা অবাক হবে। আজ অফিস তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেছে।

শোবার ঘরের দরজা বন্ধ, জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল সে।

নীরজা আর তার অন্তরঙ্গ বন্ধু বীরেন তালুকদার। প্রেসের মালিক, বড়লোক।

বিছানার উপরে প্রেমের যুদ্ধে রত তারা। এক মুহূর্তে আবার সারা জগৎ শূন্য হয়ে গেল তার কাছে।

পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল সে আবার। কয়েকদিন পরে কবিতা ফিরে এল সহসা।

রাত্রি জাগরণে মলিন হয়ে লিখে ফেলল সে বহু কবিতা। আবার যশ-খ্যাতির শিখরে ফিরে গেল সে।

পত্রিকাটি ফুলে উঠল। সাহিত্যগোষ্ঠির নায়ক হল সে। কিন্তু সহ্য করতে পারল না শহরকে, নীরজাকে।

যোগাযোগ ক'রে পশ্চিমে পাড়ি দিল। এয়ারপোর্টে নিকটবন্ধু ও

ভক্তদের অনুরোধ ক'রে গেল, স্ত্রী-পুত্রকে দেখবার জন্য নয়, পত্রিকাটি বাঁচিয়ে রাখতে।

ফিরে এল সে। ডিগ্রী এনেছে, অর্থ এনেছে। কবিতার অনুবাদ দিয়ে বিদেশের মন জয় ক'রে এনেছে।

এখন তার বিশ্রাম। সে যা চেয়েছিল, পেয়েছে। বাঁধানো খাতার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছে সে।

নীরজার দিকে চেয়ে হাসি এল। এরই জন্য দেশ ছেড়ে অন্য প্রান্তে সে ছুটেছিল ? অর্থের অন্বেষণে ব্যাকুল হয়ে ফিরেছিল। অর্থ পেয়েছে, বড় চাক্‌রি এখন এখানে জুটেছে। দেশবিদেশের নারীর মন সে জয় করেছে।

কবিতা তাকে সব দিয়েছে—খ্যাতির সূত্র ধরে আজ সে সমৃদ্ধিকে পেল। এখন ?

ভক্তবৃন্দ একখানি শীর্ণ পত্রিকা হাতে দিল, "আপনার পথ চেয়ে অতিকষ্টে একে বাঁচিয়ে রেখেছি। এবার আপনি হাতে নিন। আমরা আর পারছি না।"

পুণ্ডরীক মিশ্র সাহেবী পোশাকে টেবলে বসে নতুন কর্মভারের খসড়া করছিলেন।

হাত বাড়িয়ে পত্রিকাখানি নিল।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল বাঁধানো খাতাখানি। ঝাউগাছের নীচ, ঝরে-পড়া পাতার গালিচা, আকাশের পাজপাখি। সেখান থেকে কবিতা তাকে এতদূর ঠেলে এনেছে।

শহর, খ্যাতি, ভক্ত, প্রেম, অর্থ সমস্ত কিছুই সে লাভ করেছে কবিতার মাধ্যমে।

কিন্তু কতটুকু মূল্য দিয়েছে ?

যখনই একটার অভাব হয়েছে নিরুপায় ব্যাকুলতায় সে কবিতাকে আঁকড়ে ধরেছে। সুখের সময় কবিতাকে ভুলে থেকে ছিল সে।

পত্রিকা তার কাছে কাব্যসাহিত্যের পাদপীঠ নয়, নিজের প্রচারের বাহন মাত্র।

তাই পত্রিকায় মায়া।

আজ পত্রিকার কি প্রয়োজন! যা চেয়েছিল, সব পেয়েছে।

এই যে আধুনা মোটাসোটা, বিদেশী পোশাকধারী, সাহেবী-ভাবাবলম্বী ব্যক্তি—তার জীবনে কাব্য অবান্তর।

মোটা মলাটের কোন খাতা অবান্তর।

উঠে কোণের ইজিচেয়ারে লম্বমান হ'ল সে, হাই তুলে বলল, "নতুন কাগজটায় অনেক সময় দিতে হবে। ওসব আর ভালো লাগছে না। যা হয় তোমরা করো।"

ভক্তেরা শঙ্কিত মনে প্রশ্ন করল, "তার মানে ?" পুণ্ডরীক সিগারেট ধরিয়ে স্পষ্টভাষণে উত্তর দিল, "আমার সময় নেই। যদি চালাতে না পারো, পত্রিকাটা উঠিয়ে দাওনা।"

এই—যে-কোন একটি পত্র-পত্রিকার উঠে যাবার ইতিহাস।

অনেক দূরে

আজ অনেকদিন আগের এক কাহিনী মনে পড়ে। আমার অজ্ঞানতার কুয়াশায় আমার অজ্ঞাতসারে সে কাহিনীর জন্ম। আমার চেতন-মনের কোন অভিব্যক্তিতে তার বিলয়।

জীবনের ওপর দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ বয়ে যায়। যখন সাময়িক শান্তি আসে তরঙ্গ-ভঙ্গ থেকে, তখন দেখি আনন্দের কাহিনী কেবল বয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তখন আপাতদৃষ্টিবদ্ধ সত্তা আনন্দের সঙ্গমে জোয়ার দোলায় দোলে। মনে হয় এ অনির্বচনীয়; অধিকতর প্রভাব-শালী কোন ঘটনাই থাকতে পারে না। কিন্তু অবশেষে দেখা যায়, বালির ওপর নিঃশব্দে, গোপনে আঁচড় রেখে গেছে অন্য কয়েকটি ঘটনা। আনন্দের অগোচরে তাদের স্থিতি। তারা বিষাদের স্মৃতি।

সেই সমস্ত স্মৃতির কোন একটি সূত্র ধরে ফিরে যাই দূরের দেশে—পেয়ারাগাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের আলো ছায়ার সৃষ্টি করেছে, প্রাচীরের মাথায় হয়তো তেলাকুচো গাছে লাল ফল ঝুলতো। খানিক শহর, খানিক গ্রাম—সেই বসতিতে এবাড়ি-ওবাড়ি যাবার পথ এঁকে বেঁকে গ্রাম্য পথের রূপ নিয়েছিল।

একখানা দোতলা বাড়ি। অনেক বছর আগের কথা। কলিকাতায় তখন বাসগাড়ি হয়নি। চড়কডাঙ্গা রোডটা খালের পুল পার হয়ে শহরতলীর অবজ্ঞাত নাম নিয়েছিল। রাজাবাজার পর্যন্ত হেঁটে এলে ট্রাম মিলত। ঘোড়ার গাড়ি তখনও রাজা।

খালের পুল পেরিয়ে নারকেলডাঙ্গা-চড়কডাঙ্গা। পল্লীগ্রাম থেকে

কেউ কেউ শহরে অর্থ বা বিদ্যার্থে এসে ওখানেই ছোটখাটো বাসাবাড়ি বাঁধতেন। একজন আত্মীয়ের আওতায় অন্যদল বাসা খুঁজে পাশা-পাশি থাকতেন। ঔপনিবেশিক রূপ ছিল তাঁদের। পদ্মাপারের গ্রাম থেকে শহরে উপনিবেশ স্থাপনা।

দোতলা বাড়ির পাশে কয়েকটি বাড়ির একটি যৎসামান্য কিছু বা মনে আছে, কিছু বা মাতার কাছ থেকে স্মৃতির ঝোলায় সঞ্চয় বাড়িয়েছি। এ বাড়িখানাও দোতলা। সামনে গাড়িবারান্দা, খোলা আকাশ মাথায়। বর্ধিষ্ণু ঘোষ পরিবারের বাড়ি। ওঁরা আরও বাড়ির মালিক, আস্তাবলের মালিক। বাড়ি ভাড়া দেন। আস্তাবলে নিজের গাড়ি ঘোড়া রাখার পরেও উদ্বৃত্ত স্থান ভাড়া দেন।

বাড়িতে পূজামণ্ডপে জাঁকজমকে পূজা হয়। জিষ্ণু ঘোষ শুধু পৈত্রিক উত্তরাধিকারে প্রীত নন। তিনি চাকৃরি ক'রেও রোজগার বাড়ানোর দিকে মন দিয়েছেন। এক কথায় অবস্থা তাঁদের অতি সচ্ছল।

আজ হঠাৎ কালো হয়ে আসা আকাশের দিকে চেয়ে স্মৃতির পাখনার দ্রুত উত্থান-পতনের শব্দ শুনি। শুনি অলক্ষিতে প্রান্তর সীমায় কোমল পদক্ষেপ। ঘোষবাড়ির বারান্দার রেলিং ধরে অনেক-দিন আগে যে মেয়েটি নাচানাচি করেছিল, সে তো এখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি আমার জীবনে।

জিষ্ণু ঘোষের ছোট মেয়ে কেন জানিনা পাশের বাড়ির বাচ্চাটির ওপর অতি সদয় হয়ে উঠল। কয়েক মাসের বাচ্চা সে। কিন্তু মায়ের জলবসন্ত হওয়াতে কষ্টের সীমা ছিল না।

ঝি রাখা হ'ল। গভীর রাত্রে বাচ্চার অস্ফুট আর্তনাদ শুনে পাশের ঘর থেকে রুগ্না মা দেখতে এলেন। প্রায় কৃষ্ণজাতকের

অবস্থা। স্থূলাঙ্গিনী নিদ্রিতা দাসীর স্তনভার বাচ্চাটির মুখে-চোখে চাপা পড়ায় সে প্রায় দমবন্ধ হয়ে যায়। চাপা-ক্ষীণ কণ্ঠে সে শেষ চেষ্টা করছে এমন অসহায় মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে। আর ছোট্ট হাত-পা যতটুকু মুক্ত আছে, প্রাণপণে চালনা ক'রে যাচ্ছে কারও দৃষ্টি আকর্ষণের আশায়।

রাত্রির তৃতীয় প্রহরে টিম্‌টিমে আলোয় ভয়াবহ দৃশ্যটি খুকীর মাকে আতঙ্কিত করলো। নিজের অস্পৃশ্যপ্রায় অবস্থা ভুলে তিনি ঝি-য়ের কাছ থেকে খুকীকে বুকে তুলে নিলেন। কেটে গেল তার জীবনের প্রকাণ্ড একটা ফাঁড়া।

ঝি বিতাড়িতা হ'ল। অতঃপর প্রতিবেশিবৃন্দ স্তন্যপায়ী শিশুকে ঠিকমত আহার্যদানের ব্যবস্থা করলেন। ঘোষ-বাড়ির নিভা সদ্য-প্রসূতা ছিলেন।

দিনে দুইবার খুকীকে তার বাড়ি থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হত। মোটাসোটা সুশ্রী মেয়ে। অনেকেই স্নেহশীলা হলেন।

ঘোষ-বাড়ির ওই বারান্দা, কি দালানে, কোথাও যেন অহেতুক অযাচিতভাবে দেবতার করুণা জন্ম নিল। একটি দশ বছরের ফ্রক-পরা মেয়ের মনে। একদিন বাড়ির সকলকে বিস্মিত ও কৌতুকী ক'রে সে বলে উঠল, "আমি খুকীর শাশুড়ী হবো।" মা হতে সে চায়নি নিশ্চয় খুকীর জ্বলজ্যান্ত বিদ্যমানা মাতা উপস্থিত থাকার হেতু। সেই মায়ের সঙ্গেও যে প্রতিযোগিতায় হেরে যাবে, এই ভয় ওর ছিল। কাজেই যা হতে পারে না, সে জন্য সে চেষ্টা না ক'রে হাত বাড়িয়েছিল 'সেকেণ্ড বেষ্ট'-এর দিকে। সেদিন তার ওই ঘোষণা অনেকের কাছে পাগলামি বিবেচিত হলেও, আমার কাছে আজ যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়।

তলিয়ে গেল নাম তার, অতঃপর শাশুড়ী নামেই সে পরিচিত হ'ল।

বাঙালীর মেয়ে খেলার ঘর গড়বার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে সংসারের স্বপ্ন। ভবিষ্যৎ পুত্রের স্বপ্ন দেখে সে, দেখে ভাবী পুত্রবধূর স্বপ্ন। তাই দশ বছরের মেয়ের মনে কোন খটকা রইল না, সে যে ফাঁকি দিল, সে কথা কে বলবে আজ? তার যা দেবার ছিল, হয়তো সবই সে দিয়ে গেছে। জীবন তার কাছে চায়নি বলেই দেওয়া তার বাদ পড়ে যায়নি। অলক্ষিতে কোথাও পাওনার বোঝা হয়তো এতই ভারী হয়ে জমেছে যে, আজ কলম-কাগজ সে ঋণ শোধ করতে পারবে না।

শাশুড়ী খুকীর স্বয়ংবৃত্তা দ্বিতীয়া জননী হল। যদি কোণ অণুবীক্ষণে মানুষের মনের চরম সত্যটি গ্রহণযোগ্য হত, যদি সেই অণুবীক্ষণ শাশুড়ীর মনে ফেলা যেত তাহলে দেখা যেত খুকীর মা না হয়েও শাশুড়ী হিসাবে বাধ্যতামূলক 'মা' ডাকটি শুনবার বাসনা তার কত প্রবল। সে কায়স্থ, খুকী ব্রাহ্মণ, এই প্রভেদের অনিবার্য ফল সেদিনের যুগেও চড়কডাঙ্গা রোডে বসে তার মনে এল না। একদা, এই শিশু বড় হয়ে তারই সম্পত্তি হবে, এ বিষয়ে শাশুড়ীর সংশয় ছিল না। দশবছর বয়সের অনূঢ়ার ভাবী পুত্রবধূ তখন আট মাসে পা দিয়েছে, এ হেন তথ্যে শাশুড়ী কিছুমাত্র বিব্রত বোধ করল না। ক্ষীণ শ্যাম দেহটি নিয়ে, ছিটের ফ্রক দুলিয়ে সে ছুটে আসত হাজারবার খুকীর কাছে, "আমার বৌ কই? আমি ওকে একটু কোলে নেব।"

নিয়ে যেত খুকীকে সে কোলে ক'রে নিজের বাড়ি, অন্যের বাড়ি। যখন যা পেতো এনে রাখতো খুকীর শিয়রে। খুকীকে আদর ক'রে, যত্ন ক'রে, তৃপ্তি ছিল না ওর। চড়কডাঙ্গায় তখন দুই চারিটি স্কুল হয়েছে। মেয়েদের স্কুলে শাশুড়ী পড়তে যেত, কিন্তু মন রেখে যেত খুকীর কাছে। স্কুল থেকে ফিরে মুখে জল দেবার আগেই হাঁফাতে

হাঁফাতে সে ছুটে আসত খুকীকে দেখার আশায়।

এমনি স্নেহনিবিড় যুগের উপর যবনিকাপাত হ'ল। খুকুর আইনজীবী বাবা আদলতে যাতায়াতে অসুবিধা হেতু শহরতলী থেকে শহরে চলে গেলেন। পাশাপাশি বাড়ির মধ্যে ভেসে উঠল বহু মাইলের ব্যবধান।

তবু আসতো সে, শাশুড়ী বউ-এর কাছে। বেনেপুতুল হাতে এনে রেখে যেতো, রেখে যেতো পিতলের হাঁড়িকুড়ি। হয়তো তখন থেকেই বউকে সংসারকর্মে দক্ষ হবার শিক্ষা সে দিচ্ছিল। খুকীর ও তার বাড়িতে যাতায়াত করত দু' বাড়ির লোকজনেরা। শাশুড়ীর কাছে খুকীর বিশদ বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না দিয়ে কারুর স্বস্তি পাবার উপায় ছিল না। বালিকা অনবরত প্রশ্নজালে বিব্রত ক'রে তুলত আগন্তুককে। গমনেচ্ছুকে বলে দিত, "বৌকে বলো তার শাশুড়ী তাকে দেখতে যাবে শিগ্‌গির।"

এ যুগের উপরও একটা যবনিকা পড়ে গেল। জিষ্ণু ঘোষ বয়স্থা কন্যাব বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। অনেক ত্রুটি ছিল শাশুড়ীর আকৃতিতে। রূপহীনতার অভিসম্পাতে সে লাঞ্ছিতা। তবু, জিষ্ণু ঘোষের টাকা শিক্ষিত সুন্দর পাত্র কিনে আনল।

আজ আকাশে যখন মেঘ ওঠে, যখন পুরাতন জগৎ বিলুপ্ত হয়ে যায় কুয়াশার অন্তরালে, অনেক যুগ আগে ফিরে যায় মন—ঝরঝর বর্ষণ বর্তমান ঢাকে, ঢেকে দেয় ভবিষ্যৎ! সেই পুঞ্জীভূত অন্ধকারে, ধারাপাতে পুরানো স্মরণ মনে করা ভিন্ন উপায় কি? রোমন্থন করা স্মৃতির কণ্ডুয়নে তাকে দেখি—ক্ষীণ, শ্যামদেহ, পাতলা চুলে প্রচুর তৈলদানে মসৃণ খোঁপা, চোখ ট্যারা তার, মুখে পান দোক্তা টিপে রেখেছে। মিহি কলের শাড়ির চওড়া পাড়, হাতের একগোছা

চুড়িবালা সিঁথি সিঁদুর বুঝিয়ে দিত মহিলা-জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু, ওখানেই শেষ।

যে রূপ নিয়ে জন্মাতে পারেনি, রূপাভিমানীকে তারই জন্য কেন খুঁজে বার করা হয়? আত্মার সারল্য দেখে যে সানন্দে বরমাল্যে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, সে পাত্র পাওয়া না গেলে, অনূঢ়া থাকাই রূপহীনার উচিত। পিতা অর্থ দিয়ে পাত্র কিনতে পারেন, মন কিনবে কে?

বিবাহ দেন অভিভাবকেরা সমাজে মাথা তুলে চলবেন বলে, 'আমার মেয়ের পাত্র জুটেছে।' পাত্রী রঙীন স্বপ্নে মোহিত হয়ে লোহার বলয় হাতে পরে। কিন্তু চলে না, জোর ক'রে কিছুই চলে না।

অনিবার্য ফল ঘটল। পাত্র কোনদিনই অর্থের লোভে কুরূপাবরণ সহ্য করতে পারেনি। তার বৌ মাথায় একটু ছিটগ্রস্তা। বড়লোক বাপের বাড়ি, কাজ শেখেনি, মেজাজ মানিয়ে চলার নয়। সুতরাং শাশুড়ী পরিত্যক্তা হ'ল। পিত্রালয়ে ফিরিয়ে দিয়ে গেল তারা কালামুখীকে। কারণ, বউ পছন্দ হয়নি।

যে আট মাসের মেয়েকে ভবিষ্যৎ বৌ বলে সন্তুষ্ট ছিল, তারই নিজের বৌ হবার যোগ্যতা রইলো না! পরাজয়ের লজ্জা মেখে সে ফিরে এল বাবার বাড়ির পুরাতন বেষ্টনীতে। তখন সে বাড়ির দেওয়ালে শ্যাওলা ধরেছে, আস্তাবলে ঘোড়ার পা-ঠোকা শোনা যায় না।

জিষ্ণু ঘোষ বিগত হলেন ভাঙনের মুখে। ভাইদের গলগ্রহ তখন বিপদে পড়ল। লেখাপড়া শেখা হয়েছে সামান্য। এখন এত বয়সে আর পারবে না। ভাইয়েরা ক্রমেই গরীব হয়ে যাচ্ছে। বৃহৎ সংসার। বাধ্য হয়ে সে হাতের কাজ শিখতে গেল। তাঁতবোনা বেছে নিল।

এই তাঁতবোনা মেয়েটিকে নিয়ে আমার কাহিনীর তৃতীয় অধ্যায়

আরম্ভ করি।

একখানা আধুনিক বাড়ি বালিগঞ্জে। চাতালে একটা গালিচা পাতা। সেখানে কয়েকজন বসে আছেন। শাশুড়ী এসেছে অনেক বছর পরে। দেখা করতে এসেছে সে।

সত্যই হয়তো মাথায় ছিট ছিল তার। এতগুলি বছরের ব্যবধান যেন ওর কাছে কিছুই নয়। ব্যাঙ্কে টাকা জমা আছে, ঠিকঠাক সুদ তুলে নিলেই হ'ল। অবলীলাক্রমে শাশুড়ী খবর দিল খুকীর মাকে, 'খুকীকে বলুন ওর শাশুড়ী এসেছে।'

তারপরে যে মেয়েটি এসে দাঁড়াল স্থির হয়ে ঘূর্ণ্যমান পাখার নীচে, তাকে, আর যা হোক, শাশুড়ীর বৌ বলা চলে না। শাশুড়ীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, সপ্রতিভ ভাব অদৃশ্য হল। হাতে একটা ভিনোলিয়া সাবানের পুরোনো সাদা বাক্স ছিল শাশুড়ীর। অপ্রতিভ হয়ে সে নাড়াচাড়া করতে লাগলো সেটাই।

যে এসে দাঁড়াল, সে এম. এ. ক্লাশের ছাত্রী। উগ্র আধুনিকত্বে এখনই বিখ্যাত হয়েছে। চোখে চশমার মধ্যে থেকে যে দৃষ্টি শাশুড়ীর প্রতি বর্ষিত হ'ল তাতে আহ্বানের সাদর আমন্ত্রণ লেখা নেই। একটু আগেই শাশুড়ী এসেছে, শাশুড়ী এসেছে বলে বাড়িতে হাসিঠাট্টার ফোয়ারা ছুটেছিল। মেয়েটি বিরক্ত ও লজ্জিত হয়েছে। কোনমতে ভদ্রতার আবশ্যিক দাবী সেরে সে উঠতে পারলে বাঁচে। এক-আধবার সে ওঠবার উদ্দেশ্যে উসখুস করছিল। কিন্তু তার মায়ের কাছে এমন পলায়ন দারুণ অধর্মের ব্যাপার বলে পরিগণিত। তাই অনিচ্ছায় সর্বক্ষণ অতিথির সম্মুখে গালিচায় তাকে বসে থাকতে হ'ল।

শাশুড়ী হাঁ ক'রে দেখতে লাগল। এই কি সেই শিশু, যাকে সে বাহুর দোলায় দুলিয়েছে, বুকে চেপে আদর করেছে। সেদিন পর্যন্ত

অসঙ্কোচে বর্ধনশীলা বালিকার হাতে বেনেপুতুল দিয়ে গেছে। মধ্যে কয়েকটি বছর শাশুড়ী নিজের বিবাহিত জীবন নিয়ে অশান্তিতে ছিল। দেখা করতে পারেনি। তারই মধ্যে বালিকার এতই রূপান্তর!

আসতে পারেনি শাশুড়ী, তাতে যে ক্ষতি হবে মনে করেনি। তার খুকী তার বৌ, সে কি তার থাকবে না? সে কি তাকে ভুলে যাবে, যেতে পারে? শাশুড়ীর অপ্রতিভ আঙুল সাবানের বাক্সটা বারে বারে নাড়াচাড়া করতে লাগল। বাক্সের অকথিত রহস্য উন্মোচিত আর হ'ল না।

আধুনিক মেয়েটির কোথাও মমতার রেখা নেই। হাস্যকর সম্বন্ধ স্থাপনাকে প্রশ্রয় দেবার মত একবিন্দু হাসি লিপ্‌ষ্টিকের রংকে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে পারলো না। লজ্জা ও বিতৃষ্ণা গোপন করার চেষ্টায় তার মধ্যে ফুটে উঠল সুদূর জটিলতার ছাপ, উত্তরকালে কখনও যা ভীতিপ্রদ হয়ে দাঁড়াত।

শাশুড়ী তার শাশুড়ীত্ব থেকে স্খলিত হ'ল নিঃসন্দেহে। সে স্বামী পরিত্যক্তা, রূপহীনা, অশিক্ষিতার চিরন্তন ভূমিকায় সেজে এল। কালো মুখখানি তার একটু যেন ধূসর দেখাল।

যবনিকা ওখানেই শেষবারের মত পড়লো।

আজ স্মৃতির পৃষ্ঠার পুরাতন লেখা যখন পড়ি, তখনই অস্পষ্ট, জড়ানো কাটাকুটির মধ্য থেকে ফুটে ওঠে সেই মুখ—একটু অসুখী, একটু বিস্মিত ও অপ্রতিভ কালো মুখটি। বাংলা দেশের যত দুঃখী, নিষ্ফল জীবনের মেয়ে আছে, তাদের সঙ্গে অচ্ছেদ্যশৃঙ্খলে যুক্ত সেই মুখ বারে বারে আমার মনে পড়ে যায়। সে আমার দরজায় এসেছিল। সে ফিরে গেছে।

সে আমার শাশুড়ী হতে চেয়েছিল, তাই বোধ হয় কঠিন ঈশ্বর তাকে পুত্রের অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন। যে আমার ঘর বেঁধে দিতে চেয়েছিল, তারই ঘর ভেঙে গেল।

সাবানের বাক্সে সে এনেছিল উপহার—কোন উপহার সেই ছোট মেয়েটির জন্য। দিতে পারেনি সে আধুনিকী তরুণীর হাতে তার সামান্য উপঢৌকন। ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সে।

কিন্তু, আজ তো আমার অসংখ্য উপকরণে ভারাক্রান্ত দিন তৃপ্ত নয়। শূন্যতা নিশ্বাস ফেলে প্রাচুর্যের মধ্যে। শূন্যতা বলে যায়ঃ যা পাবার, তুমি তো নাওনি?

তাই আমার অজস্র-উপহার বিড়ম্বিত দিন বারে বারে ফিরে তাকায়। ফিরে চায় সে কবেকার না দেওয়া ছোট, সামান্য কোন উপহার। এক মুহূর্তে বিস্বাদ জীবন হাত বাড়ায় সেই দুর্লভ উপহারের দিকে। ছোট বস্তুর অভাবে এত কি শূন্যতা?

বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল

এদেশে বরফ পড়ে না। বরফ ঝাট দেবার জন্য কোন ঘুঁটেকুড়ুনীর মেয়েকে নিযুক্ত করতে হয় না। অবশেষে সেই ঘুঁটে কুড়ুনী পরীর বরে রাতারাতি রাজকুমারের মন হরণ ক'রে মহারাণী হয়ে বসে না। এদেশের গল্পও নয়।

এদেশের অন্য গল্প আছে, আমি তা জানি। তুহিনের ঝড় আল্পসের ওপারে ঠেলে রাখলেও এদেশে বৃষ্টি পড়ে অজস্র ধারায়। ঝড় ওঠে। গরীবের কুঁড়েঘর উড়ে যায়, পুরনো বাড়ি ধ্বসে পড়ে। গাছের তলায়

রেফিউজী ভেজে। বন্যায় বাড়িঘর ভেসে যায়। বরফ পড়ার গল্প তো এর কাছে ছেলেমি। এদেশে ঘুঁটেকুড়ুনীর ঘুঁটেই শুকোয় না। তায় আবার সে রাজরাণী হবে।

এমনি বর্ষার দিনে মল্লিক বাড়ির সামনে বাঁধানো উঠোন, সিঁড়িগুলো পরিষ্কার করছে পারুল। বর্ষার দিনে বাড়িঘর নোংরা হয়ে যায়। নিত্যকার ঝি-চাকর বাড়তি কাজ করতে চায় না। অথচ দিনে দু'তিনবার জল ঝাঁট দিয়ে, ধূলো-বালি-পাতা পরিষ্কার ক'রে না দিলে তো বাড়ির সামনে অপাংক্তেয়। জমাদারের দ্বারা হয় না। অতএব গৃহিণী রাজমিস্ত্রীর কন্যা পারুলকে উক্ত কাজের জন্য সাময়িকভাবে বহাল করলেন।

এই বাড়িতে মিস্ত্রীর কাজ লেগেই থাকে। প্রাচীন বনেদী বাড়ি। এখানে সুরকি ঝরছে, ওখানে কাঠ খসছে। বড়মিস্ত্রী তদারক ক'রে কাজকর্ম করিয়ে দেয়। পাড়ার বকুল গাছটা পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই মিস্ত্রীর বস্তী।

মিস্ত্রী ধরাধরি করেছিল। অনেক সন্তানের জনক সে। দিন চলে না। তের বছরের পারুলকে একটা কাজ দিলে তার বড় উপকার হয়। ছোট মেয়ের এখনও বিয়ে দেয়নি মিস্ত্রী। তের বছরে পা দিলে কি হবে, ঝিরকুটে চেহারা পারুলের, বাড় নেই। বিয়ের বাজারে দর উঠবে কি ক'রে। তাছাড়া, পারুল না থাকলে পারুলের মায়ের হাতে-হাতে কাজ করা, ছোট ছোট ভাই চারটিকে মানুষ করার লোক থাকবে না। অতএব পারুল মিস্ত্রীর ঘর আলো ক'রে আছে।

এ বাড়ির লোকজনকে পারুলের বড় ভাল লাগে। বাড়িভর্তি লোকজন। নানা বয়সের, নানা ধরনের। তাছাড়া লোকগুলির ভালত্বের সীমা নেই। গরীব ঘরের হেলাফেলার সন্তান পারুল।

মা-বাবা ভালমুখে কথা বলে না কখনও। এহেন পারুলের হাতে যদি বাড়ির বিলাসিনী ছোটবউ একটা বিবর্ণ সিল্কের জামা অবহেলায় দান করে, তবে তো পারুলের দিন লাল হরফে ছাপার মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বড়বৌ সোপকেসে নতুন সাবান রাখতে গিয়ে তলানী ক্ষয়ে-যাওয়া গন্ধ সাবান তুলে দেয় পারুলেরই হাতে—কারণ দুই চোখ চা-কাপের সসারের রূপ ধরিয়ে পারুল হাঁ ক'রে এ বাড়ির লোকের কাজকর্ম গিলবার জন্য সামনেই উপস্থিত। দিদিমণিরাও কখন একটা ফিতে, একটা গাটাপার্চার ক্লিপ ফেলে দেয়। পারুল মোটের ওপর বেশ ভাল আছে।

সবচেয়ে পারুলের ভাল লাগে বাড়ির ছোটছেলে শুভেন্দুবিকাশকে। সারাক্ষণ নিজের ঘরে বসে বসে নীল কাগজে, সাদা কলমে কি যেন তিনি লেখেন। আদ্দির পাঞ্জাবী, গিলে-ধুতি, সাদা নাগরা তিনি সর্বদা পরেন। কাছ দিয়ে হেঁটে গেলে ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়।

কিন্তু, না, আপনি ঠকে গেলেন। তের বছরের ওই কি বলে—হরিজনকুমারীর ধনীকুমারের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ, স্বপ্ন সফল হওয়া, বিয়ের বাজনা বাজা, এ সমস্ত আমি লিখতে বসিনি। সিণ্ডেরেলার গল্পটা বেমালুম চুরি করার মত মনোবলও খুঁজে পাই না। তা ছাড়া, আমি যে ভাল ক'রেই জানি সিণ্ডেরেলার গল্প কত মিথ্যা। ঘুঁটেকুড়ুনী রাজরাণী হয় না। আমি তো হতে দেখিনি।

অতএব পারুলের সিণ্ডেরেলার সঙ্গে মিল কেবল বাইরে। তার কোন পরী পেট্রন নেই—নিমন্ত্রণ বাড়ি ধার-করা পোশাক পরে যাওয়ার কল্পনা তার মাথায়ও ঢোকে না।

তবে শুভেন্দুকে ভাল লাগে যে বড়? কারণ, শুভেন্দুর কথাবার্তা। কেমন যেন অন্য রকম লাগে পারুলের। ভারি ভাল লাগে।

শুভেন্দু নাকি বই লেখে। পারুলের মত মানুষকে নিয়ে কালির অক্ষর গেঁথে গেঁথে গল্প বানায়। অবাক হয়ে পারুল দেখে আর আকাশ-পাতাল ভাবে।

একদিন বৈঠকখানার সামনেটা পরিষ্কার করার পরে পারুলকে গিন্নীমা দোতলার বারান্দা পরিষ্কার ক'রে দিতে বলেছিলেন। টানা বারান্দার ছুই পাশে ঘর চলেছে। একখানা ঘরে বসে শুভেন্দু লিখছে।

পারুলের দিকে চোখ পড়ল। ছোট ঝিরকুটে একটা মেয়ে অবাক হয়ে চেয়ে আছে। শুভেন্দু প্রশ্ন করল, "তুই কে?"

পারুল বিনীত উত্তর দিল, "আমি বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল।"

সেই তার নাম হয়ে গেল শুভেন্দুর কাছে। দেখা হলেই শুভেন্দু ওই নামে ডাকবে, "কি রে বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল, তোর বাবার মত বড় হবি কবে?" অথবা "কি বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল, হালচাল কেমন?"

একদিন পারুল বলেছিল, "ভাল আছি, বাবু।"

"ভাল আছিস, বলিস কিরে? বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল ভাল থাকতে পারে নাকি? ভাল থাকা যায় না। ভাল থাকা চলে না।" গানের গলায় শুভেন্দু বলে উঠল। পারুল অবাক হয়ে চেয়ে রইল। বাড়ির লোকে শুভেন্দুবাবুকে পাগল বলে সাধে?

কি যে লেখেন বাবু রাতদিন? অন্য বাবুরাও লেখাপড়া ক'রে পাশ দিয়েছেন, শুনেছে পারুল। কিন্তু তাঁরা দিনরাত এমন কাগজ-কলম নিয়ে বসে থাকেন না। পারুলের জটপড়া, উকুন-ধরা মাথা ব্যথা হয়ে গেল শুভেন্দুবাবু কি লেখেন তাই ভেবে ভেবে।

পারুলকে কাহিনীর নায়িকা করায় বিপদ হয়েছে। পারুল 'গোবরে পদ্মফুল' নয়। হ'লই বা মিস্ত্রীর মেয়ে। যদি ওর বর্ণনায় তিলফুল

নাসা, পটলচেরা চোখ বসাতে পারতাম, তবে আমার পারুলকে নিয়ে গল্প লেখার মানে হত। পারুল কাল, শান্ত, ছোট চেহারার একটি মেয়ে। তের বছরে পা দিয়েছে, যৌবন এখনও অনাগত।

যদি পারুল অসামান্যা হত, তাহ'লেও চলত। পারুল যদি বাবুর বাড়ির ছেঁড়া বই কুড়িয়ে, রাত জেগে নিজেকে জ্ঞানী করবার চেষ্টা করত; পারুল যদি কান ফেলে রেডিও বা রেকর্ডে গান শুনে হঠাৎ একদিন দোয়েল-কোকিলের গান গেয়ে উঠত, তবে পারুলের ভবিষ্যৎ আমি দেখাতে পারতাম।

কলমের এক আঁচড়ে আমার পারুল চতুর্ভুজ হয়ে স্বর্গে যেতে পারত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করত বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল, স্বদেশী ক'রে জেলে যেত; হাসপাতালে ডাক্তার হত; সুধাকণ্ঠী চিত্রকণ্ঠ হত বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল। কিন্তু হায়, পারুলের মত এমন গুণহীনা নায়িকা আমি কমই পেয়েছি।

চরিত্রগত অসামান্যতাও যদি থাকত পারুলের! কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দর্পিত সংকল্প, আগ্নেয়গিরির মত মেজাজ, প্রতিমুহূর্তে দীনতাবোধ, স্বপ্নালু ভাব থাকলে পারুলের চরিত্রের কেমন সহজ রূপ দিতে পারতাম, বলুন তো? কিন্তু, পারুল হচ্ছে নির্বিকার, সাধারণ এক মেয়ে, যে একটি সন্তানের জন্ম দিতে হলে অথবা পাঁচটি সন্তানের জন্ম দিতে হলে একই ধরণে প্রতিক্রিয়া দেখায়। নেহাৎ বাজে মানুষ একটা পারুল।

যদি শুভেন্দুবিকাশের প্রেমে কোনমতে পা পিছলে পড়ত পারুল, তবে কাজ হত। নীরব এবং ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা নিয়ে ঘ্যান-ঘ্যান ক'রে পাতা ভরিয়ে ফেলতাম আমি নিঃসন্দেহে। কিন্তু, পারুল যে ছোট। অশিক্ষিত মিস্ত্রীর অপরিণতদেহী মেয়ে, কেবল স্বয়ংসিদ্ধভাবে

দেহকে বুঝতে শেখে ওই বয়সে, প্রেম চেনে না। শুভেন্দুবিকাশ যদি পারুলের হাতে একখানা পাঁচ টাকার নোট গুজে দিয়ে ওকে সন্ধ্যার অন্ধকারে হাস্নু-হানার ঝোপের ধারে দেখা করতে বলত, তাহ'লে পারুল চট ক'রে সাড়া দিতে পারত। কিন্তু, লেখককে চোখে দেখা মাত্র প্রেমে-পড়ার নায়িকা বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল নয়। শুভেন্দুর প্রতি ওর আছে বিস্ময়, কেবল বিস্ময়।

তবে, কিসের জোরে পারুলকে নিয়ে একটি কাহিনী রচনা করতে পারি? এই আখ্যায়িকায় স্থান পাবার কারণ কি আছে পারুলের? দেখা যাক। এইবার চোখ-কান বুজে গল্প আরম্ভ করি।

লালমাটির রাস্তা ধরে কিছুদূর গেলেই খোলার চালের ঘর, মাটির উঠোন, পারুলের দেশ। একটু দূরেই যে প্রাসাদ, সেই প্রাসাদের পেছনে এমন বস্তি থাকতে পারে জানা যায় না।

পারুল রাস্তা দিয়ে চলছে প্রাত্যহিক কাজের পরে। মাসের পয়লা। চার টাকা মাইনে তো পেয়েছে, তা'ছাড়া আরও একটি রজতমুদ্রার ভারে পারুলের অঞ্চল ভারাক্রান্ত।

পারুল গিন্নীমাকে আবেদন দিয়েছিল, "আমি ও-বেলা এসেও কাজ ক'রে দিয়ে যাব। তাহ'লে বিকেলবেলা সিঁড়িগুলো পরিষ্কার থাকবে।" আসল কথা, এই সুযোগে প্রাসাদে যতক্ষণ থাকা যায়।

গৃহিণী অবশ্য ভুল বুঝলেন। টাকার অঙ্কটাই বাড়াবার উদ্দেশ্যে বোধ হয় পারুল কাজের সময়ও বাড়াতে চাইছে। মুখে হেসে 'না' বললেন। কিন্তু মাসান্তে মাইনের অঙ্কে একটা টাকা যোগ করলেন, "নে, তুই বায়স্কোপ দেখিস।"

তাই আজ ঝিরকুটে পারুলের গতির পেছনে জোয়ারের উৎসাহ। ঘাড় দুলিয়ে রাস্তার দুই পাশ খরদৃষ্টিতে দেখতে দেখতে চলেছে পারুল।

অন্যমনস্কভাবে বিড় বিড় ক'রে কি যেন বলছে। অভ্যাস খারাপ পারুলের। নিজের মনে উচ্চারণ ক'রে কিছু আওড়ানো ওর অভ্যাস আছে। এখনও বলছে—"হটর-মটর! খটর-খটর!"

মানে নেই কথাগুলোর অবশ্য। কিন্তু পারুলের অবচেতন মনে অর্থ আছে। বেলি-দিদিমণি আজ নতুন হাইহীলের জুতো পরে মার্বেল বাজিয়ে হাঁটছিলেন। সেই বাজনা দুই কান ভরে এনেছে পারুল বয়ে। সেই গানই গাইছে সে বাড়ি ফেরার পথে। না, রেডিও-রেকর্ড নয়, পাড়ার বখা ছেলের গুঞ্জন নয়—বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল জুতোর হীলের গান গাইছে—

"হটর-মটর! খটর-খটর!"

খটর-খটরের গান বন্ধ হ'ল পারুলের বাড়ির কানাচে এসে। ইয়া হুলো। তাক ধরে বসে আছে পাশের ঝোপে ঝাড়ে চেয়ে, মাঝে মাঝে ল্যাজের ডগা নাড়ছে। দুইটি শালিকের চক্ষুশূল সে হয়েছে। তারা গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছে। হুলো নির্বিকার।

হুলো, না সুন্দরবনের বাঘের বাচ্চা যেন। পারুল অন্য গান ধরল:

"ডোরাকাটা বাঘ,
ডোরাকাটা বাঘ।"

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের শিহরণ অশিক্ষিত-অজ্ঞানী মেয়েটির শিরদাঁড়া বেয়ে উঠল। বাতির মিটমিটে আলোয় ঘুম-না-আসা প্রহরে মাতার ভয় দেখানো বাঘ! ভাইদের জ্বালাতনে পারুলের মুখেও বাঘের ভয় দেখানো লেগে থাকে। অনার্য মনের আধো আলো-ছায়ায় বাঘের ভয়, সাপের ভয় গাঁথা। শহরের কোন জায়গা ব্যাঘ্র দেবতার বাসোপযোগী নয়। একটু দূরে ঘন বন, শহর ছেড়ে। থাকলেও

সেখানে তাঁরা থাকতে পারেন। কিন্তু, কেউ দেখেনি। তবু বাঘের নামে মেয়েটির শরীরে চমক জাগে, মনে ভয়ের দোলা লাগে। শিশুমনের ভয়। সুতরাং বাঘের গান বন্ধ হয়ে গেল।

বাড়ির দেওয়ালে পোষ্টারের প্রদর্শনী। বস্তির দেওয়ালের এধারে জানলা নেই। অতএব পোষ্টার লাগিয়ে লাগিয়ে দেওয়ালের সুরকি-বিহীন চূণের রংটা ঢেকে দাও। মেটে উঠোনে পারুলের মা উনুনে রুটি সেঁকে রাখছে। তিন বোন পারুলের বড়; বিয়ে হয়ে গেছে ওদের। মোটা টাকা পণ নিয়েছে মিস্ত্রী। চার মেয়ে চার ছেলে মিস্ত্রীর অবদান। চমৎকার হিসাব মিলিয়ে সাজানো। প্রথমে চার বোন, তারপরে চার ভাই। মিস্ত্রী মানুষ, মাপ-জোখ দেবার অভ্যাস জীবনেও আছে। কিন্তু, অসাবধান মাপে সংসারের মাপের চেয়ে সন্তান সংখ্যার মাপ অধিক হয়ে গেছে। বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি।

আকাশে রোদ—সোনার মত চক্‌চকে রোদ, নীচের ঘাসে রোদের ছায়া। পারুলের মনে খুশী। কাজটা ভাল জুটেছে তার। হঠাৎ কেমন এক আশ্চর্য পরিবেশে জন্ম-হাভাতে পারুল হাসি কুড়িয়ে ফেরে। ভারি চমৎকার কিন্তু। অবোধ কৃতজ্ঞতাবোধ মনের কোণ থেকে ঠেলে ওঠে। ভাল খাওয়ার পরে, কোন দুর্যোগের রাত্রি নিরাপদে কেটে যাবার পরে অজানা শক্তির উদ্দেশে অনার্য মনের এমনি কৃতজ্ঞতাবোধ দেখা দেয়। যে জীবন সাদা-শূন্য ছিল, তারই পাশে পাশে সোনালী পাড় বোনা হয়েছে, তারই বুকে গোলাপী সূতোর ফুল উঠেছে বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুলের।

মায়ের কাছে দাঁড়াল পারুল। একহাতে উনুনে রুটি সেঁকার চিম্‌টে ধরে মা অন্যহাত বাড়াল নিরুত্তরে। নিরুত্তরে চার টাকা হাতে তুলে দিল পারুল। আঁচলে অন্য টাকাটাও চোখে পড়ল মায়ের।

"ওকি র‍্যা ?"

"ওটা গিন্নীমা আমাকে বায়াসকোপ দেখতে দিয়েছেন।"

"বায়াসকোপ দেখতে আর হয় না। দু'দিন চাল নেই, রুটি হচ্ছে। চাল আনগে।"

পারুলের মুখ শুকিয়ে গেল। ফ্যাকাশে কপালে ঘাম দেখা দিল। টাকাটা হাতে শক্ত ক'রে ধরে সে ঘাড় দুলিয়ে বলল, "চার টাকা তো দিলাম। ওতে চাল আনগে।"

"হারামজাদীর হিসাব দেখ ? দে আজ টাকাটা। কাল নিতে মাইনে পাবে, তখন বায়াসকোপের পয়সা নিস্।"

এখানে পারুলের মা যদি পারুলকে দুই ঘা বসিয়ে দিত, হাঁউমাউ ক'রে সে কাঁদত, তবে গল্পটা জমাতে পারতাম গরীবের মেয়ের উৎপীড়িত দুঃখীত জীবন অঙ্কন ক'রে। কিন্তু পারুলের মা-ও তো সাধারণ, তাকে অযথা তাইমুরের নিষ্ঠুরতায় রং ধরাবার দরকার দেখি না। পারুলের মা অত্যাচারী নয়, যৌথ পরিবারের দাবী মাত্র তার।

অতএব পারুলকে মা 'হারামজাদী' বোলে গাল দিলে পারুল মাকে আরও খারাপ একটা কথা বলল। অনেক যা-তা লিখেছি জীবনে, একথাটা বাদ দিলে বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষতি হবে না।

"এই নে রাক্ষুসী।" পারুল টাকাটা ছুঁড়ে দিয়ে ঘরে এল। ভাইগুলো কিল্‌বিল্ ক'রে উঠল, "টাকাটা লুকিয়ে রাখলিনি কেন ?"

কিন্তু, 'বায়াসকোপ' দেখার অভাবে পারুল এমন কিছু মুষড়ে পড়ল না। ভাত খাবার আশায় সে মশগুল। নির্বিকার পারুল। কোন সাধ-আহ্লাদ তীব্রবেগে ওর মনকে আশ্রয় করে না।

হাত দিয়ে চুলের নীল ক্লিপটা ঠিক করতে করতে পারুল মেজভাইকে চাল দিল, "দেখ, আজ কি দিয়েছে।"

অতি বিশ্রী আকারের একটা অতিকায় প্রজাপতি-ক্লিপ। দিদিমণিদের অপছন্দের জিনিস পারুল পেয়েছে।

ওঁরা সর্বদা জিনিসপত্র দেন, কখনও বা টাকা-পয়সা দেন। কিন্তু, খাবার-দাবার দেন না। দেবেন কেন? পারুলের মত হ্যাংলা তো ওঁরা নন।

জলখাবার খেয়ে কাজে বার হয় পারুল। ফিরে এসে আবার ভাত বা রুটি খায়। সন্ধ্যার পরেই আবার আহার। প্রাসাদেও লোকেরা এর চেয়ে বেশিবার খায় না, পারুল দেখেছে লক্ষ্য ক'রে। অথচ পারুলের দোষ, পারুলের সর্বদা ক্ষিধে পায়। অমন সুন্দর স্থানেও কিছুক্ষণ পরেই পারুলের পেটের মধ্যে অন্য একটা অস্তিত্ব দেখা দেয়—ক্ষুধার অস্তিত্ব।

পারুল অনাহারে আছে বলতে পারলেও গল্প জমে উঠত। কিন্তু, দেখলাম হাত-মুখ ধুয়ে কাজে যাবার শাড়ি ছেড়ে পারুল বেগুনপোড়া, কুমড়োঘণ্ট দিয়ে মোটা মোটা রুটি গিলছে গোগ্রাসে। মিস্ত্রী যেমন ক'রে হোক, ধার ক'রে হোক, টাকার যোগাড় ক'রে পাঁচটি সন্তান ও নিজেরা দুইজনের নিত্য খাবার যোগাতো। চাল না পায়, রুটি খায়, কিন্তু অনাহারে থাকে না তারা।

পারুলের দেশ বা জাত কি হয়তো জানতে চান কেউ। কিন্তু, পারুল যে-কোন দেশে, যে-কোন সমাজে জন্মাতে পারে। মনের বাগানে অনেক ফুল ফোটে, তারই পারুল ফুল সে।

বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুলের নির্বিকার, অবোধচিত্তে কিন্তু একটা ইচ্ছা জাগল। মাথামুণ্ডু নেই সেই ইচ্ছার। শুভেন্দুকে সে অনায়াসে ইচ্ছার কথা জানাল।

শুভেন্দুর বেয়ারার কয়েকদিনের অসুখ। পারুল কাজের ভার পেয়েছে। মনে যথেষ্ট আনন্দ পারুলের। স্যাঁৎসেঁতে মেজে, টিনের চাল, সুরকিবিহীন ইঁটের দেওয়ালঘেরা বস্তি ছেড়ে যতক্ষণ এখানে থাকা যায়, ততই ভাল।

শুভেন্দু লিখতে লিখতে দেখল সসারের মত দুই চোখ পারুল ঘর মুছছে হাতে, চোখে তার লেখা গিলছে। শুভেন্দু কলম রেখে দিল।

"কিরে বড় মিস্ত্রার ছোট মেয়ে পারুল, কি দেখছিস ?"

"কি লিখছেন বাবু ?"

"লিখছি গল্প।"

"কার গল্প ?"

"এই তোর-আমার মত লোকের গল্প।"

"কি হবে গল্প দিয়ে ?"

"বইতে ছাপা হবে। সবাই পড়বে। সবাই জানবে আমাদের কথা।"

পারুল ভাবতে লাগল বিস্মিত হয়ে। দিন দুই ভাবার পরে সে শুভেন্দুর কাছে প্রস্তাবটা করল।

"বাবু, আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখুন।"

বলে কি মেয়েটা ? কাল-ঝিরকুটে বার বছর তিন মাসের মিস্ত্রীর মেয়ে। সে হঠাৎ বিখ্যাত হতে চায়।

শুভেন্দু বল্‌ল, "লিখব রে লিখব, বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল।"

"কবে লিখবেন, বাবু ?"

"যবে তোর মত আর একজন লোক খুঁজে পাবি।"

"কেন ?"

"তুই বড় ছোট। তোকে একা নিয়ে গল্প হয় না। তুই যদি অনেকের এক হতে পারিস, তবেই তুই আমার গল্পে ঢুকতে পারবি।"

পারুল অবাক হয়ে গেল। অহোরাত্র তার চিন্তা হ'ল কি ক'রে এখন আর একটি লোক যোগাড় হয়। কিন্তু, আর একটি লোকের গল্পটা কি? সে গল্প আর তার নিজের গল্প কি ক'রে এক হবে? তার নিজের গল্পটাই বা কি?

সন্ধানী পারুল সন্ধানী-দৃষ্টি মেলে পথঘাট বাড়িঘর সমস্ত খুঁজে দেখতে লাগল, কখন কি পাওয়া যায়? কবে শুভেন্দুর গল্পে তার প্রবেশলাভ হবে?

সেদিনও পথ দিয়ে চলছিল পারুল। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে গলায় তার অর্থহীন কথার মালা ঃ—

"চাঁদ-চাঁদ, চাঁদ-চাঁদ, কামরাঙা রে"—

ভাবার্থ ঃ আজ বাড়িতে চাঁদামাছ এসেছে, দেখে এসেছে পারুল। এখন দুপুর। দুইবেলা মাছ হবে। চাঁদ উঠলেও তখন তারা মাছ খাবে। পথের বাগান থেকে কামরাঙা অপহরণ ক'রে নিয়ে চলেছে পারুল। বেজায় টক—মা যদি গুড় যোগাড় ক'রে অম্বল রাঁধে!

ছোকরা বেয়ারা চলেছে অফিসের পথে। পারুল সহগামী তার। স্বাভাবিকভাবেই কথা হ'ল।

বেয়ারা বলল, "ও খুকী, আপন মনে বক্‌বক্‌ করছ কি? তুমি পাগল নাকি?"

কথাটা শুনে পারুলের গা জ্বলে গেল। পাগল তাকে কেউ বলে না, প্রাসাদের শুভেন্দুবাবুকে পাগল বলে। মুখখানা হাঁড়ি ক'রে পারুল উত্তর দিল, "তোমার তা দিয়ে দরকার?"

"চটো কেন খুকী? কোথায় কাজ করো তুমি?"

তারপরে পরস্পরের আলাপ-পরিচয়, নাম বিনিময় হ'ল। কিন্তু এখানেও গল্পের মোচড় পেয়ে ছেড়ে দিলাম বাধ্য হয়ে। ছোকরা

বেয়ারা ও খুকী-ঝি প্রেমে পড়ল, একটু বড় হ'ল, বিয়ে করল তারা। কিন্তু, জীবনের আসল গল্পে ছোকরা বেয়ারার পারুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ মাত্র একটি দিনের।

ছোকরা বেয়ারা নিজের কথা বলল: "বাবুর বাড়িতে থাকি, অফিসে কাজ করি।"

"বাড়ির কাজ কি?"

"সকালে উঠে ঘরঝাট, বাসনমাজা, চা করা"—

লোভী পারুল বাধা দিল, "চা খেতে দেয়?"

"দেয় এককাপ।"

"কি কি খাও তুমি রোজ? জলখাবার পাও?" কাজ সেরে ফিরছে পারুল। পারুলের সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলছে ক্ষুধা।

ছোকরা বেয়ারারও আহারের বর্ণনায় অনুৎসাহ দেখা গেল না। জিভের ডগা ঠোঁটে বোলাতে বোলাতে সে বলে চলল:—"সকালে চা খাই। তারপর ভাত দেয়। বাড়ি ফিরে চা, জলখাবার পাই। রাত্রে খেতে দেরী হয় কিনা। রাত্রে আমাকেই রাঁধতে হয়।"

রান্নাঘরের চার্জ যার হাতে, সে তো সর্বশক্তিমান পারুলের চোখে। মা কেমন যা ইচ্ছে রান্না করে, যাকে যা খুশি খেতে দেয়! পারুল সসার-চোখ হয়ে বলে উঠল, "কি মজা তোমার!"

"মজা কিসে খুকী? আগুনের পাড়ে বসে রান্নায় কি মজা থাকে?"

"আমার নাম পারুল, খুকী নয়। মজা না তো কি? সমস্ত খাবার জিনিস তোমার হাতে।"

ছোকরা বেয়ারা হেসে উঠল, "কি বোকা তুমি, পারুল? প্রত্যেকটি ভাজা, আলুর টুক্‌রো পর্যন্ত গুণে দেয়। একটা জিনিসও মুখে তোলার উপায় নেই!"

ততক্ষণে বকুলগাছের তলায় দু'জন দাঁড়িয়েছে। হাতে গুণে দেখল পারুল বেয়ারার খাবার তার সঙ্গে সমান। বড়লোকদের সঙ্গেও প্রায় সমান। তবে? তারা ক্ষোভ জানাতে পারে না।

"আচ্ছা, তোমার ক্ষিধে পায়?" পারুল জানতে চায় ক্ষুধার শিকার একমাত্র সেই কিনা।

"পায় না আবার? এক একবার মনে হয় অফিসের টেবিল-চেয়ার শুদ্ধ গিলে ফেলি।"

"অথচ দেখ, আমরা কতবার খাই। আমরা না খেয়ে নেই তো। বড়বাড়ির লোকেরা তো আমাদের চেয়ে বেশি খায় না। কিন্তু, আমাদের এত ক্ষিধে পায় কেন?"

দু'জনে যথারীতি অবাক হ'ল।

"আজ কি খেয়ে বেরিয়েছ?" পারুল প্রশ্ন করল।

"আজ বেশি কিছু ছিল না, ডাল আর চচ্চড়ি।" একটু থেমে ছোকরা বেয়ারা যোগ দিল, "আর ভাত।"

খাবারের নামে পারুলের জিভ লক্-লক্ করছে। সকালে খেয়ে বেরিয়েছে, বেলা দশটা বাজে। এরই মধ্যে ক্ষিধের জোর তাগিদ।

ছোকরা বেয়ারা ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি খেয়েছ?"

"বাসি রুটি ছিল, গুড় দিয়ে খেয়েছি। ঝোলা গুড়।" মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল পারুলের। সে বলল, "আজ আমাদের মাছ এসেছে, অনেক মাছ। হেরম্বকাকা জেলে-নৌকা থেকে চুরি ক'রে এনেছিল। অর্ধেক দামে বাবাকে বেচেছে। মা আমাকে পেট ভরে মাছ খাওয়াবে। কেন জানো? বাবুদের বাড়ি কাজ আমার পাকা হয়ে গেল। আমাকে ওরা ছাড়াবে না আর।"

এখানে গল্পের আরও একটা মোচড় আমার নষ্ট হয়ে গেল। গরীব হরিজনকে বড়লোক হেনস্তা করছে দেখাতে পারলে রাতারাতি গল্প আমার সিনেমা হত। কিন্তু, পারুলকে মনিবেরা ভালই বাসে। বোকা হলে গরীব বড়মানুষের প্রিয়পাত্র হয়, লক্ষ্য করেছি।

দু'জনে আবার পথ চলছে। একটু চিন্তান্বিত ভাব। একটু পরে পারুল বলল, "যা ক্ষিধে পেয়েছে! এত ক্ষিধে যে কেন পায়? আমরা তো অনেকবার খাই।"

ছোকরা বেয়ারার পথ এবার পারুলের থেকে ভিন্ন বাঁক নেবে। যাবার আগে একটু থেমে ভেবে নিয়ে সে বলে গেল, "আমাদের ক্ষিধে পায়, তার কারণ, শুধু যে আমরা হ্যাংলা তা নয়। আমরা বার বার খেলে কি হবে, কোনও বার তো ভরপেট খেতে পাইনে। বড়লোকেরা আমাদের সঙ্গে বারে সমান খেলেও ভালমন্দ জিনিস যত ইচ্ছা খেতে পায় পেট পুরে। তাই ওদের আমাদের মত ক্ষিধে পায় না। আমরা খেতে পেলেও যতটা দরকার, ততটা তো পাইনে কখনও। এই তো আমি ভাত খেয়ে বেরিয়েছি, কিন্তু, এখনই ক্ষিধে পেয়েছে। বাবু খেয়ে বার হবেন, কিন্তু ওঁর ক্ষিধে পাবে না। রসিয়ে-রসিয়ে যত খুশি ওঁরা খান তো।"

নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাটি দিয়ে ছোকরা বেয়ারা নিজের পথ ধরল। পারুলও বাড়ি ফিরল।

চাঁদা মাছের ভোজ খাবার পরে পারুল ভাবল, একটু ঘুমিয়ে নিলে হত। দিনে সে ঘুমোয় না, ঘুমোবার অভ্যাস নেই। কিন্তু ঘুম ঘুম লাগে কেন রে?

দুপুরে খাবার পরে বড়মিস্ত্রীর বৌ সূচী-শিল্পের ক্লাস খোলে। ছেঁড়া জামা-কাপড় রিফু করে, কাঁথা সেলাই করে শীতের উদ্দেশ্যে।

চট্‌চটে সতরঞ্জির ওপর মায়ের পাশে গড়িয়ে গেল পারুল।

পারুল ভাবছে : ছোকরা বেয়ারা ঠিক কথা বলেছে। খেলে কি হবে ? পেট ভরে খায়না তারা। যার যা হিসাবমত ভাগ, তার বেশি তারা পায় না। চাইতে তারা জানে না, চাওয়া নিয়ম নয়। প্রত্যেকে চারখানি বরাদ্দ রুটি যদি পায়, পাঁচখানির জন্য হাত বাড়ানো চলবে না। তাই বোধহয়, তাদের কলাই করা থালায় এক কুচি আহার্য দেখা যায় না, ভোজনের পরে। খেয়ে উঠে রোজ পারুলের থালা ধুতে যাবার মুখে কেমন খালি-খালি বোধ হয়। আরও ভরাট কিছু পারুলের মধ্যে থেকে ঠেলে উঠলে হয়তো লাগতো ভাল। হাড়ভাঙ্গা খাটুনী যে পরিমাণ রসদের জন্য হাত বাড়ায়, সে পরিমাণ রসদ যোগানো তাদের ঘরে সম্ভব নয়। তাই বার বার ক্ষুধা তাদের দ্বারে হানা দিয়ে থাকে। তারা নিয়মিত খেলেও তাদের খাওয়াটা খাওয়া নয়। ভাবতে ভাবতে পারুলের ঘুম এসে গেল। আজ বরাদ্দ আহারের ওপর মাছ ছিল। ভাত মা আরও একবার দিয়েছে। তাই গা এলিয়ে আসছে। একে বলে ভরাপেট। কেমন শান্তির ভাব সারা গায়ে !

পারুলের চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

পারুলের মা তাকিয়ে দেখল, পারুল ঘুমিয়ে পড়েছে। তা পড়ুক, রোজগারী মেয়ে। গায়ে এখন একটু মাংস লাগলেই পণের টাকার অঙ্ক বেড়ে উঠবে। এবারকার টাকা দিয়ে জামা-কাপড় করানো হবে। ততদিনে নিতের সঙ্গে সঙ্গে হরে, সিধু রোজগার ধরবে। শুধু বাচ্চা ছেলেটাকে বসিয়ে খাওয়াতে হবে। তারামায়ের পূজো দেবে বড় মিস্ত্রীর বৌ, সংসারে একটু সুরাহা হলেই। প্রসাদ বেঁটে দেবে পাড়ায়। কি প্রসাদ ? মাংস, ভাত, বোঁদে। ভবিষ্যৎ সম্পদের আনন্দে বড় মিস্ত্রীর বৌ জেগে জেগে স্বপ্ন দেখতে লাগল।

আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগল তার মেয়ে—বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল।

সেই হুলো, যার উদ্দেশ্যে পারুলের অমরগীতি রচিত হয়েছিল :—

ডোরা-কাটা বাঘ !

ডোরা-কাটা বাঘ !—

সেই হুলো বিবাট হয়েছে—জঙ্গলের মধ্যে চোখ জ্বলছে তার। শালিকের দল ভয়ে পালিয়ে গেছে। হুলো আর হুলো নয়, সত্যই ডোরা-কাটা বাঘ ! প্রস্তুত হয়ে আছে লাফিয়ে পড়বার জন্য শিকারের উপর। সে ক্ষুধার প্রতীক।

কিন্তু, পথ অনেক দূরে চলে গেছে, বাঘের গায়ের গন্ধ ছেড়ে। বকুল ঝরে সেখানে। কত লোক চলেছে। এত লোকের মধ্যে পারুল মিশেছে। তবু কি শুভেন্দুবাবু পারুলের গল্পটা লিখবেন না ?

পারুল নিজে জানল না যে, আজ তার গল্পের দোসরের দেখা সে পেল। শুভেন্দুর কাহিনীর নায়িকা হওয়ার যোগ্যতা এল তার আজ।

ঘুমন্ত অনার্য মনের আলো-ছায়ায় গাঁথা বাঘের ভয় পেরিয়ে পা চলেছে পারুলের। মুখে বিড় বিড় : ডোরা-কাটা বাঘ !

ডোরা-কাটা বাঘ !—

আস্তে মিলিয়ে গেল একঘেয়ে ছড়া। ছোকরা বেয়ারা চলে গেল। আরও ছোকরা বেয়ারা আসবে। কারুর একজনের সঙ্গে বকুল-ঝরা লালমাটির পথে চলবে বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল। পেছনে তাদের থাবা মেলে তৈরি থাকবে ওই হুলো—বাঘ। তবু তো বকুল-ঝরা পথে চলা আছে, অনেক ছোকরা বেয়ারার মধ্যে একজনের সঙ্গে। অনেকের মধ্যে বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল একজন। অনেকের মধ্যে তারা দু'জনে একজন।

শেষ

